পরিচয়



পরিচয়

২৫ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৬২ ॥ ৭ম সংখ্যা

প্রচ্ছদপট খালেদ চৌধুরী
প্রচ্ছদচিত্র পাহাড়পুরের মূর্তি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

সম্পাদক
গোপাল হালদার ॥ ননী ভৌমিক

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত এবং পরিচয় কার্যালয় ৮৯ হ্যারিসন রোড কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

বাংলার নামে

পরিচয়

মাঘ। ১৩৬২

মৃত্যুহীন কবিকণ্ঠে

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান ॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পুর্ণ হউক, পুর্ণ হউক, পুর্ণ হউক,
হে ভগবান ॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে ভগবান ॥

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যতো ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান ॥





॥ সম্পাদকীয় ॥

বাঙলার বিলুপ্তি

গত ২১শে জানুয়ারী পশ্চিমবাঙলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার জনসাধারণ যে শান্ত মর্যাদার সঙ্গে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের স্বপক্ষে আপনাদের প্রতিবাদ ঘোষিত করেছেন, সর্বাগ্রে সেজন্য তাঁদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। অন্যায় যখন মানুষের সমস্ত নিবেদনকে পদদলিত করে চলে তখন হতাশ মানুষের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। পূর্বে অন্ধ্রে, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ও উড়িষ্যায় আমরা তা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। তাই বাঙলার প্রতিবাদে সংযম ও শুভবুদ্ধির সংযোগ দেখে আমরা গৌরব বোধ করেছি।

কিন্তু ন্যায় ও জনমতে যাদের আস্থা নেই, মানুষের সংযম ও শুভবুদ্ধিকে তারা মর্যাদা দেবে কেন? তাতে তাদের বরং সাহসই বেড়ে যায়। নইলে ২১শের প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি শেষ হতে না হতেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বাঙলা বিলোপের প্রস্তাব নিয়ে কলকাতায় পদার্পণ করলেন কি করে? বিহার বিলোপের প্রস্তাব নিয়েই বা পাটনায় উপস্থিত হলেন কি করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ—যে বিহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে ১৯১২তে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল? এ কোন দুঃসাহস যে দুই মুখ্যমন্ত্রীর একজনাও দুইটি রাজ্যের বিলোপের প্রস্তাবে অনায়াসে অঙ্গীকার করেন একবারও রাজ্যের জনমত সংগ্রহ না করে? আর এ-ই বা কোন্ গণতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক বোধের পরিচয় যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই ইতিহাসবিরোধী জাতি-নাশী প্রস্তাবকে সাড়ম্বরে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসের মারণ-

উচাটন যন্ত্রকে এই অন্যায় উদ্দেশ্যে এমনভাবে প্রয়োগ করেন? সম্ভবত জনমতের সুশৃঙ্খল মর্যাদাময় প্রকাশের অপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খল ক্ষিপ্ত প্রকাশকেই তাঁরা গুরুত্ব দিতে শিখেছেন।

অন্তত সন্দেহমাত্র নেই, বাঙলা-বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরা পরোক্ষে এই প্ররোচনাই দুই রাজ্যের উত্ত্যক্ত জনসাধারণকে দিয়ে নিজেদের অপচেষ্টা ও অন্যায়ের সমর্থন খুঁজছেন। সংকল্পে ও সংযমে সুদৃঢ় বাঙালী জনসাধারণের আজ তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন—কংগ্রেস নেতৃত্বের এই ঘৃণিত অভিসন্ধি ও ভয়াবহ অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করা; দুর্জয় শৃঙ্খলা ও দৃঢ়সংকল্পের বলে বাঙালীর রাজ্য, বিহারীর রাজ্য, বাঙলার নাম, বিহারের নাম ভাষার ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা; ভারতের সমস্ত জাতি-উপজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতীয় মহাজাতির সংহতি ও আত্মবিকাশ সুনিশ্চিত করা; ভারতের ইতিহাসের প্রধানতম সত্য, বাঙালীর সংস্কৃতির প্রিয়তম সাধনা—বিচিত্রের মধ্যে একের প্রকাশ—রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে অনমনীয় প্রতিজ্ঞায় উদ্‌যাপিত করা।

এমন বাঙালী আমরা কে আছি যে জানি না, আমরা ভারতবর্ষের সন্তান? যে জানি না, ভারতীয় মহাজাতির সাধনা আমার সাধনা—বিহারের সৌভাগ্যে, আসামের সৌভাগ্যে, উড়িষ্যার সৌভাগ্যে আমার সৌভাগ্য? এমন বিহারী, এমন অসমীয়া, এমন ওড়িয়াই বা কে আছেন যিনি বিস্মৃত হবেন বাঙালীর সুখ, বাঙালীর দুঃখ তাঁর সুখ নয়, তাঁর দুঃখ নয়; ভারতীয় মহাজাতির যে-কোনো একটি অঙ্গ হীনবল হলে তিনিও হীনবল, তিনিও দুর্বল না হন? যদি থাকেন সে বাঙালী নিশ্চয়ই দেশদ্রোহী, সে বিহারী নিশ্চয়ই দেশদ্রোহী, সে অসমিয়া, সে ওড়িয়াও দেশদ্রোহী। কিন্তু এমন বাঙালী বা বিহারী কে আছেন যিনি মনে করেন—তাঁর বাঙালী সত্তার বিলোপই ভারতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে প্রয়োজন,

বিহারের বিলোপে ভারতীয় সংহতি সম্ভব, বিহার-বাঙলাকে 'একাকার' করে না দিলে ভারতবর্ষের ঐক্য স্থাপিত হবে না ;—ভারতবর্ষ শুধু ইউরোপীয় ছাঁচে-ঢালা একটা সর্বগ্রাসী 'নেশন', ভারতবর্ষের আপন সাধনায় আপন বৈশিষ্ট্যে বিকাশমান একটা মহাজাতি নয়, আগামী দিনের মানব-মহামৈত্রীর প্রথম উদার স্বাক্ষর নয় ?—এমন কেউ থাকলে তিনি শুধু বাঙলাদ্রোহী, বিহার-দ্রোহী নন, তিনি ভারতদ্রোহী, ইতিহাসদ্রোহী, ন্যায়-ও-সত্যদ্রোহী।

এই ইতিহাসদ্রোহের অভিসন্ধি নিয়েই না লর্ড কার্জন বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন ? তবু তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাত্র বিভাগ করা, বাঙলাকে বিলোপ করা নয়। কার্জনী চক্রান্তই সাম্রাজ্যবাদী কুটিল পথে সার্থক হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যখন স্বেচ্ছায় আমরা আইন-সভায় তা মেনে নিলাম। আজ আর পূর্ব বাঙলা 'পূর্ব বাঙলা' নয়, 'পূর্ব পাকিস্তান' ; রক্ত দিয়েও পূর্ব বাঙলার বাঙালী ভাইবোন এখন পর্যন্ত তাঁদের বাঙালী সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে উঠতে পারেন নি। অথচ সেই কার্জনী চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকস্বার্থবাদের কুটিলতর ইঙ্গিতে আজ পশ্চিমবাঙলার ও বিহারের সম্পূর্ণ বিলোপের প্রস্তাব তুলেছে কংগ্রেস মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মুখ দিয়ে। লর্ড কার্জন যা করতে পারেন নি, ডাঃ বিধান রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তা-ই করতে চান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা কার্যে পরিণত করতে পারে নি, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর কংগ্রেস-চক্র তা-ই করতে অগ্রসর। বাঙলা বলে কোনো দেশ আর থাকবে না, এই তাদের উদ্দেশ্য। পণ্যোপজীবী সংবাদপত্র-মালিকের সহায়তায় ও ক্লীবত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেসী সদস্যদের ভোটের জোরে ছাড়া এই কার্জনী-চক্রান্তকে কোনোরূপেই এই কংগ্রেসী-নেতৃত্ব দেশের মাথায় চাপিয়ে দেবার পথও পান না। এত বড়ো বিপর্যয়কারী প্রস্তাব

এত অকস্মাৎ উত্থাপন করে এত তাড়াতাড়ি আইন-সভায় পাশ করিয়ে নেবার চেষ্টা বোধ হয় কার্জনও করতেন না, ইতিহাসেও অশ্রুতপূর্ব। কেন ? লোকমত-সংগ্রহে আপত্তি কেন ? কেন অদূরের নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে এ-প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হতে আশঙ্কা ? কেন জনসমাজের সম্মুখে মুখ দেখাতে দ্বিধা ?

কার স্বার্থে, কার কল্যাণে বাঙলার বিলোপ, বিহারের বিলোপ ? ভারতবর্ষের ? সে তো দেখেছি—এ নীতি ভারতদ্রোহ—ভারতের সমস্ত সাধনার অস্বীকৃতি। বাঙলা-বিহারের অর্থনৈতিক বিকাশ ? উদ্‌বাস্তু বাঙালীর পুনর্বাসনের সুবিধা ? এখনই বা তাতে বাধা জুটছিল কেন ? বাঙলা ও বিহার দুই-ই তো ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে সংযুক্ত ; তবে আবার নতুন করে কি সংযুক্ত হবে ? ডাঃ রায়-সিংহদেরই 'মার্জার' নীতিতে ? আর এখন যদি ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দুই ভ্রাতৃরাষ্ট্র হয়েও—ভারতব্যাপী কেন্দ্রীয় শাসনের অধিকতৃত্ব সত্ত্বেও—তারা অর্থনৈতিক বিকাশে একমত হতে পারে না, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলহ করে, তাহলে দু রাজ্যকে কাল এক করে দিলেই বা তাদের মতের ঐক্য স্থাপিত হবে কি করে ? উদ্‌বাস্তুর ভাগ্যে চাষযোগ্য জমি বা জীবিকার পথ খুলে যাবে কোন্ প্রান্তে—জনবহুল বিহারের নিরন্ন জনসংখ্যা নিজেরাই যখন কলকাতার কলে-কারখানায় ছাড়া বিহারে জমি দেখে না, জীবিকার সামান্য পথও পায় না ? আর বাঙালী ও বিহারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ মিলিয়ে যাবে কোথায়, যতক্ষণ উভয়ে নতুন সমাজের পত্তন করতে না পারছে ? বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তা-ই হবে যা এখন হচ্ছে মানভূমে-পূর্ণিয়ায়।—এখনো তো মানভূম ঐ 'মার্জার-নীতি'র ফল ভোগ করছে ; আর ১৯১২ পর্যন্ত তো বিহারও ফলভোগ করেছে এরূপ 'মর্কটনীতির'।

আমরা জানি—বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবাঙলার কংগ্রেস-নেতৃত্ব বাঙালী মধ্যবিত্তকে এই প্রলোভন দেখাবেন, 'বুদ্ধির জোরে আমরা বিহারকে চরিয়ে খাব।' আর বিহারের কংগ্রেস নেতৃত্ব বিহারীদের বোঝাবেন, 'সংখ্যার জোরে আমরা কলকাতা ও পশ্চিম বাঙলা হস্তগত করব।' ঘৃণার সঙ্গেই এই প্রবঞ্চনার স্তোকবাক্যকে প্রত্যাখ্যান করবে বাঙালী ও বিহারী শিক্ষিত বা সাধারণ মানুষ। কারণ, ধিক্ সেই বাঙালীত্বে যে বিহারকে শোষণের মিথ্যা আশা পোষণ করে। ধিক্ সেই বিহারীত্বে যে বাঙলাকে শাসনের এই মূঢ় আশা মনে স্থান দেয়। মনে রাখবেন তাঁরা পূর্ব বাঙলার মুসলমানের কথা—ঢাকার পথে তারা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় আত্মদান করেছে। পশ্চিমবাঙলাও রক্তে লাল হয়ে যাবে তবু তার বাঙালীত্বকে বিসর্জন দেবে না। বিহারও সমস্ত দুষ্ট-কলহ ভুলে নিশ্চয়ই 'বুদ্ধিবাদী' শোষকের এই অপচেষ্টাকে লাঠিতে ঠেঙিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে—এও আমরা আশা করব। এও আমরা জানি—বাঙলা-বিহার দুই রাজ্যেরই কলকারখানা, শিল্প—সব ইংরেজ ধনিক ও টাটা-বিড়লা-গোষ্ঠীর সম্পত্তি—নিজ বাসভূমে দুই-ই পরবাসী।

—শেষ কথা, আজও আমরা জানি না, কী শর্তে কী ব্যবস্থায় দুই রাজ্য 'একাকার' হবে। ইচ্ছা করেই তা স্পষ্ট না করে প্রস্তাবটিকে আইন-সভায় গ্রাহ্য করানো হচ্ছে—ধনিকতন্ত্রের অভিসন্ধি। নীতি হিসাবেই তা-ই হবে জনসাধারণের বর্জনীয়। সমস্ত জনমতকে অগ্রাহ্য করে বদ্ধদ্বারে হয়তো কংগ্রেস সদস্যরা এই দেশদ্রোহে সম্মতি দেবেন। যদি তা হয়, তখন বাঙলা-বিহারের জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে হবে 'স্বদেশী' আমলের মতো প্রতিবাদের ঝড় তুলবার জন্য, প্রতিরোধের অনমনীয় প্রাচীর গড়বার জন্য আর উদ্দীপ্ত শান্ত-পৌরুষে আত্মদানের জন্য।

তাদের সবার নামে বলি

মণীন্দ্র রায়

এ তো খেলাঘর নয়,
মাটিতে পুতুল গ'ড়ে আচমকা আবার
ভেঙে ফেলবে অবোধ উল্লাসে!
এ যে মানুষের মন,
এ যে কোটি-বংশাবলী-চেতনার শিখা,
জ্বলবে যতোক্ষণ আছে একটিও জীবন।

জরিপের ফিতেমাপা নির্বিকার কয়েক মাইল
যা দেখ সে রাজস্বের সীমা।
আমাদেরই ঘাম রক্ত প্রেমের মন্দিরে
দেশ এক আশ্চর্য প্রতিমা!
আমরা রেখেছি তাকে স্মৃতি দিয়ে ঘিরে।

হয়তো কখনো পথে যেতে
আমরা পিছিয়ে পড়ি,
রোগে অনাহারে শোকে বেঁচে থাকি নিঃসঙ্গের ঘরে
তবুও সর্বস্ব যদি যেতে বসে পাড়ভাঙা বানে,
মাঠের ধানের মতো, শিশুর আয়ুর মতো যা-কিছু আপন
আমরাই আগলে ধরি—
হাতে হাতে বেড়া বাঁধি, মাটি ঢালি, তুলি প্রতিরোধ,
আমরা দুর্জয় স্বপ্ন গড়ি!

এ আলোয় চোখ মেলে দেখেছি যে সবুজ আকাশ,
দিগন্তের নীল গ্রাম, চষামাঠে তামাটে কৃষাণ ;
শুনেছি বুকের পাশে সলজ্জ যে বধূর নিশ্বাস,
ভোরের বাউল আর শান্তিখোঁজা সন্ধ্যার আজান ;
এ ধুলোয় জন্মে যতো পূর্বপুরুষের স্পর্শ লাগে,
যতো বীর রুক্ষ দিনে ভেঙে গেছে যন্ত্রণা-পাহাড়,
জীবনের তৃষ্ণা দিয়ে যতো কবি ভরেছে সংরাগে,
তাদের সবার নামে বলি ঃ মৃত্যু নেই এ বাঙলার ॥

সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিবাদ

[প্রতিবাদে পরিচয়ের পাঠকদেরও স্বাক্ষর দেবার জন্য অনুরোধ জানাই প. স.]

বাঙলা ও বিহার একীকরণের প্রস্তাবে আমরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতেছি। ভাষাভিত্তিক প্রদেশের যে ন্যায্য দাবি লইয়া সারা ভারতবর্ষে মুক্তিকামী জনসাধারণ জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, এই প্রস্তাব তাহাকে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে। আমরা ইহার তীব্র বিরোধিতা করিতেছি।

বাঙলাদেশ ও বাঙলাভাষা কোনদিনই প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাঙালী অকাতরে আত্মবলি দিয়াছে, সারা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য চিরদিন ভারতের ঐক্যকে শক্তিশালী করিয়াছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের ঐক্য যেমন অবশ্যপ্রয়োজন, তেমনি এই বিরাট বিচিত্র দেশে জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া সংহতি আনিবার চেষ্টা শুধু যে ভুল তাহা নহে, ভারতবর্ষের সংহতি বিনাশের তাহাই প্রকৃষ্টতম উপায়।

বিরাট মহানদীর মতো বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা যে নানাজাতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের জলধারায় পরিপুষ্ট সেই শাখাপ্রশাখা বন্ধ করিয়া দিলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারাই শুকাইয়া যাইবে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, বিহার ও বাঙলা একীকরণের যে প্রস্তাব আসিয়াছে, তাহাতে এই বিকাশ ব্যাহত হইবে, দৈনন্দিন শাসনকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে না। মানবমঙ্গলের উদ্দেশ্যেই শাসন-ব্যবস্থা—শাসনকার্যের কতকগুলি কল্পিত সুবিধার কথা ভাবিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা তাই দাবি করিতেছি, ভাষার ভিত্তিতে বাঙলাদেশকে পুনর্গঠিত করিয়া ভারতের সংহতি অটুট রাখা হউক।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত। মেঘনাদ সাহা। শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শচীন সেনগুপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। নরেন্দ্র দেব। সত্যপ্রি রায়। কাজী আবদুল ওদুদ। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রাধারাণী দেবী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গোপাল হালদার। রমেশচন্দ্র সেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আবু সঈদ আইয়ুব। খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ধীরেন্দ্রনাথ সেন। অরবিন্দ পোদ্দার। বিভূতি চৌধুরী। সুনির্মল বসু। বিমলচন্দ্র ঘোষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুশীল জানা। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সরোজকুমার রায়চৌধুরী। সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। দীপ্তেন্দ্র সান্যাল। অমরেন্দ্র ঘোষ। নরেশ গুহ। সমরেশ বসু। সরো আচার্য্য। বরেন বসু। মণীন্দ্র রায়। শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ননী ভৌমিক। প্রদ্যোৎ গুহ। কৃষ্ণ ধর। কনক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসূন বসু। অলোকরঞ্জ সরকার। সুনীল ঘোষ। বিনয় ঘোষ। সুনীল চট্টোপাধ্যায়। গোলা কুদ্দুস। দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাণা বসু। হিরণকুমার সান্যাল। রাম বসু। অমল দাশগুপ্ত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নরহরি কবিরাজ। সিদ্ধেশ্বর সেন। মানবেন্দ্র পাল। চিন্মোহন সেহানবীশ। মঙ্গলাচর চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্ল রায়চৌধুরী। অবিনাশ সাহা। দীপক মজুমদার। পুলকেশ দে সরকার। সরোজকুমার দত্ত। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ণেন্দু পত্রী। সত্য গুপ্ত। সত্যজিৎ চৌধুরী। তরুণ সান্যাল। কবিতা সিংহ। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণা দত্ত। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। সুলেখা সান্যাল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত

রণজিৎ গুহ

পর্যায়ক্রম

আঠারো শতকের শেষ তিরিশ বছরে গ্রাম-বাঙলার ইতিহাস নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। একদিক থেকে এই পরিবর্তনের শুরু পলাশীর যুদ্ধ থেকেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা সাঙ্গ হতে আরও আট বছর লাগে। ক্লাইভের কীর্তি যে প্রাচ্যের আরও পাঁচটা মামুলী রাষ্ট্রবিপ্লবের মতো কেবলমাত্র মস্‌নদ বদলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা বলার উপায় ছিল না ১৭৬৫ সালেও। কারণ এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ধাক্কা তখনও দেশের আর্থিক বনিয়াদ পর্যন্ত পৌছয়নি। এক কথায় বলা যায় যে বাংলার আভ্যন্তরিক অর্থনীতির যে সাধারণ চিত্র আলিবর্দির আমলেই ছিল তা ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পরেই শুধু ইংরাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাংলাদেশের মৌল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হল, রাষ্ট্রবিপ্লব কলমের চারার মতো একটু দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত শিকড় গাড়ল বাঙলার মাটিতে—তার আদিম অর্থনীতিতে, এবং তিরিশ বছরের মধ্যেই আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম ভূমিবিপ্লবে পরিণত হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে।

॥ পারিভাষিক ॥ Mercantilism = বাণিজ্য ধনবাদ, বাণিজ্যধননীতি ॥ Free Trade = অবাধ বাণিজ্য ॥ Private Trader = স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী ॥

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তনের ইতিহাস তাই ১৭৬৫ সাল থেকেই শুরু। কিন্তু তারও প্রথম দশ বছর কেবলমাত্র ভাঙার যুগ। যে পুরানো ইমারতের ইট, কাঠ, এমনকি ভিত পর্যন্ত খুঁড়ে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত নতুন গড়ার কাজ শুরু করাই সম্ভব ছিল না, সেটুকুই শুধু হয়েছে প্রথম দশ বছরে। তরুণ গরুড়ের মতো প্রবল ক্ষুধায় কোম্পানির রাজস্বনীতি দেওয়ানি হাতে পেয়েই বাঙলার আদিম কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। জমিদারির বদলে ইজারাদারি এবং নবাবি আমলার পরিবর্তে কলেক্টরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনীতির নাড়ীর যোগ ছিন্ন হল; অপরপক্ষে, দেশজ শিল্পের একাধিক শাখায় কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে এবং বয়ন-শিল্পে কোম্পানির কুঠির নিষ্ঠুর বিধানের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে গ্রাম্যশিল্পীকে পরিণত করা হল ভূমিহীন কৃষকে এবং কুটিরশিল্পী কৃষককে শ্রমজীবীতে। তলায় গ্রামসমাজের সঙ্গে উপরকার কেন্দ্রীয় শাসন-পদ্ধতি এবং কৃষিকাজের সঙ্গে কুটিরশিল্পের সনাতন সঙ্গতির বিরুদ্ধে কোম্পানির রাজস্ব-ও-বাণিজ্যনীতির কালাপাহাড়ী আক্রমণের ফলে যে ক্ষেত্র তৈরী হলো, তাতেই ভবিষ্যৎ ভূমিব্যবস্থার বীজ রোপণ করা হয়েছিল। কিন্তু, স্বীকার করতেই হবে যে প্রথম দশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই নানা উপদ্রব সত্ত্বেও ১৭৭৫ সাল পর্যন্তও বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে যৌথ কৃষিস্বত্ব তা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। গ্রাম-সমাজের উপরের তলায় জমিদারেরা ইজারাদারের হাতে নাকাল হয়েছে শুধু এই কারণেই যে কোম্পানির মতে তখন রাষ্ট্রই জমির মালিক, জমি জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ১৭৭৭ সালে লর্ড নর্থের কাছে ফিলিপ ফ্রান্সিস দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, "এই নীতিই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ধ্বংস করেছে।"[1] গ্রামসমাজের নিচের তলায় এই যুগে চাষী যে জমিহারা কৃষকে বা দিনমজুরে পরিণত হয়েছে তাও জমি হস্তান্তরের জন্য ঘটেনি; তার কারণ শুধু এই যে কোম্পানির বাণিজ্যনীতির হামলায় গ্রাম্য কুটিরশিল্পের সঙ্গে যৌথ কৃষিব্যবস্থার সুপ্রাচীন সম্পর্কের সূত্রটি হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাই ১৭৬৫-৭৫ এই যুগকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তুতির কাল বলা গেলেও উৎপত্তির কাল বলা যায় না; কারণ, এই

যুগে পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থার জন্য জমি তৈরী হতে থাকলেও নতুন ব্যবস্থার যে মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা, তা তখনও আইনসঙ্গত স্বীকৃতি লাভ করেনি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যথার্থ উৎপত্তিকাল তাই ১৭৭৫ থেকে ১৭৯৩ সাল। বলা বাহুল্য, আগের পর্যায়ের ভাঙনের কাজ এই যুগেও চলেছে: পুরানো জমিদারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত সর্বনাশ এই যুগেই ঘটে, সেচের অভাবে গ্রাম্য কৃষিব্যবস্থায় নিদারুণ সংকট দেখা দেয়, একাধিক দুর্ভিক্ষ বাঙলা ও বিহারে বিপর্যয় আনে, এবং কৃষকদের মধ্যে বেকারি ও দারিদ্র্যের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পুরানো ব্যবস্থার ধ্বংসলীলার মধ্যেই এই যুগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিকে এগিয়ে গেছে দুদিক থেকে: প্রথমত, এই যুগেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয় এবং ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে তা আইনে পরিণত হয়; দ্বিতীয়ত, বাঙলার কৃষিব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের অবাধ বাণিজ্যের আওতায় এসে পড়ার ফলে গ্রাম্য-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা দেখা যায় এবং কাঁচামালের জন্য এদেশের অর্থনীতির উপর ইংল্যাণ্ডের শিল্পস্বার্থের চাহিদার চাপ ক্রমেই বাড়তে থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তনের এই আঠারো বছরের ইতিহাসকে দুই পর্বে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে (১৭৭৫-৮৫) বাংলার কৃষিসমস্যা যতই ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের আওতায় এসে পড়ে, ততই শিল্প-স্বার্থের মুখপাত্রদের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন এদেশের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু হয়, তেমনি অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার কেড়ে নেবার জন্য শুরু হয় পার্লা-মেণ্টারী সংগ্রাম। পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪) এবং ম্যাকফারসনের শাসনব্যবস্থায় (১৭৮৫-৮৬) এই পর্বের শেষ। দেখা যাবে যে কোম্পানির বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যের অভিযান এবং যৌথ কৃষিস্বত্বের বিরুদ্ধে জমিদারি মালিকানার আক্রমণ, এই দুই চেষ্টাই আপাতত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একটা মাঝামাঝি আপোসে এসে থেমে যায়। দ্বিতীয় পর্বের (১৭৮৫-৯৩) বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তত্ত্বকে প্রথমে বিহারের মোকাররারি বন্দোবস্তে এবং তারপর বিহার ও বাঙলার দশসালা বন্দোবস্তে কার্যকরী করার চেষ্টা, এবং ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থেই শেষ পর্যন্ত দশসালা বন্দোবস্তের

ফলাফলের জন্ম অপেক্ষা না করে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আইনে পরিণত করা।

বাণিজ্যধনবাদ থেকে অবাধবাণিজ্যবাদ

১৭৬৫-৯৩ সালে যেমন বাঙলার কৃষিবিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছিল, তেমনি ঠিক এই যুগেই ইংল্যাণ্ডেও শিল্পবিপ্লব কদমে কদমে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই দুটি বিপ্লবের ঐতিহাসিক পরিণতি ছিল পরস্পরবিরোধী : আঠারো শতকের শেষ তিরিশ বছরে ইংল্যাণ্ড ঠিক যতখানি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে দূরে সরে আসে, বাঙলাদেশ ঠিক প্রায় সেই অনুপাতেই সামন্তবাদের দিকে আরও এগিয়ে যায়। কিন্তু বিপরীত অর্থে হলেও বিপ্লবের চাকা উভয়তই পুরো এক চক্কর ঘুরেছে : ওদেশে—কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে, বাণিজ্যধনবাদ থেকে অবাধ-বাণিজ্যবাদের দিকে; এদেশে-যৌথ কৃষিব্য থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার দিকে, প্রাচ্যের পুরানো নবাবী সামন্তবাদ থেকে পাশ্চাত্ত্যের বণিক-রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঢালাই নয়া-সামন্তবাদের দিকে। কিন্ত বিপরীতমুখী হলেও পরিবর্তনের এই দুটি ধারার মধ্যে প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

১৬৯০ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দুশো বছরের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাসকে চার পর্যায়ে ভাগ করে বার্নাল বলেছেন যে তার "দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৭৬০-১৮৩০) সত্তর বছরের গুরুত্ব বিজ্ঞানেও যতখানি রাজনীতিতেও ততটা।" এরই মধ্যে আবার ১৭৬০-১৮০০ এই চল্লিশ বছর সবচেয়ে ঘটনাবহুল। "প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ফলাফলের দিক থেকে এই যুগ সতেরো শতকের বৈজ্ঞানিক গুরুত্বকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়। ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে এই যুগেই। ······আঠারো শতকের শেষভাগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে পুঁজিবাদী আবিষ্কারসমূহের মিলন ঘটে, এবং সেই প্রক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উৎসারিত হয় তাই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদে ও বিজ্ঞানে এবং সেই সঙ্গে সারা দুনিয়ার মানুষের জীবনে রূপান্তর ঘটায়।" [২]

ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের শুরু বস্ত্রশিল্পে। ১৭৬৪ সালে স্পিনিং-জেনি উদ্ভাবন করে হারগ্রীভ্‌স্ বয়নশিল্পে যে পরিবর্তন আনেন, পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যেই তার গতি আর্করাইট ও ক্রম্পটনের প্রতিভাবলে বস্ত্রশিল্পের

অন্যান্য বিভাগে সঞ্চারিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে কয়লা ও লৌহশিল্পেও অনুরূপ অগ্রগতি দেখা যায়। এ যুগের বিজ্ঞানে সবচেয়ে বৈপ্লবিক দান বাষ্পশক্তির। ১৭৬৫ সালে ওয়াট্‌সের স্টীমইঞ্জিনে যে বিপ্লবের সূচনা হয় তারই প্রত্যক্ষ পরিণতি ১৭৮৫ সালে কার্টরাইটের বাষ্পচালিত তাঁতের প্রবর্তন। এইভাবেই বৃহৎশিল্প ও লঘুশিল্পের দুই স্বতন্ত্র ধারা যুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিল।

"এর ফল হল একদিকে সমস্ত কারখানাজাত পণ্যের মূল্যহ্রাস, শিল্প-বাণিজ্যে লক্ষীলাভ, অরক্ষিত সব পণ্যের বাজার জয় করে নেওয়া, মূলধন ও জাতীয় সম্পদের আকস্মিক বৃদ্ধি ; অপরপক্ষে, আরও দ্রুতহারে শ্রমজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় সম্পত্তি নাশ ও রুজির অনিশ্চয়তা," ইত্যাদি ···। [৩]

ব্রিটিশ অর্থনীতি ও সমাজের এই পরিবর্তন অবশ্যই অনিবার্যভাবে তার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে উপনিবেশে হানা দিল। মূলধন তার কৈশোরের বাণিজ্যধনবাদ থেকে বেপরোয়া যৌবনের দিকে অবাধবাণিজ্যের রাস্তায় পা বাড়াল। কারখানাজাত পণ্যের অব্যাহত রপ্তানি ও কারখানায় জোগান দেবার জন্ম কাঁচামালের অবাধ আমদানির উপর তখন ব্রিটিশ শিল্পের জীবন-মরণ নির্ভর করে। ফলে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির যে গুরুতর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে উঠল, তার চাপ পড়ল কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ে ও বাঙলার বস্ত্রশিল্পের উপর। ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে কৃষিস্বার্থ ও শিল্পস্বার্থের যে কঠিন সংগ্রাম তখন চলছিল তারই প্রভাবে একদিকে শুরু হল পার্লামেন্টের মধ্যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের মুখপাত্রদের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব ও অপরদিকে, ভারতবর্ষে কোম্পানির সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ বড়লাটের কাউন্সিলে জমির সরকারী মালিকানার নীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্বের সংঘাত।

১৭৭৫ সালের পরেই যে অবাধবাণিজ্য স্বার্থের সঙ্গে বাণিজ্যধননীতির সংঘর্ষ চূড়ান্ত তীব্রতা লাভ করে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবই তার একমাত্র কারণ নয়। ১৭৭৬ সালে আমেরিকা ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে, এবং এই প্রকাণ্ড রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য, নৌবিধান ও ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। বিশেষ

করে, একটা গোটা সাম্রাজ্য হাতছাড়া হবার ফলে অবাধ বাণিজ্যের চাপ অখণ্ডভাবে এসে পড়ল ভারতীয় উপনিবেশে। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে বাণিজ্যধনবাদের সংকটের প্রসঙ্গে কানিংহামের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"আমেরিকান উপনিবেশগুলি যখন মাতৃদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল, তখন আমাদের পোতবাহী বাণিজ্যের সমগ্র প্রকৃতি অনিবার্যভাবেই পরিবর্তিত হল ; সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্য আগে যে সব আইন করা হয়েছিল, নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় তার প্রয়োগ আর সম্ভব হল না, এবং এইভাবে বাণিজ্যধনবাদী ব্যবস্থার আরও একটা প্রকাণ্ড বিভাগকে আবার ঢেলে সাজতে হল।......নানা নিষেধের দ্বারা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করায় কার্যক্ষেত্রে যে সব গুরুতর বিপদ দেখা দেয়, বাস্তব ও ব্যবহারিক যে ক্ষতি তাতে হয় আডাম স্মিথের্ রচনাবলী সেসব কথা জনসাধারণের মনে গভীর-ভাবে মুদ্রিত করে দিল।"[৪]

একাধিকার বনাম অবাধবাণিজ্যবাদ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে অবাধবাণিজ্যবাদের আক্রমণ আডাম্ স্মিথের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষার্ধের অনেক পুস্তিকায় তার সাক্ষ্য আছে। ১৭৬৬-৬৭ সালে চ্যাথামের মন্ত্রিত্বকালে যখন একবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রসঙ্গ পার্লামেন্টে ওঠে তখন জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক "দি অ্যাবসোলিউট নেসেসিটি অব্ লেইং ওপ্ন্ দি ট্রেড টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ" (লণ্ডন, ১৭৬৭) অর্থাৎ "পূর্বপ্রাচ্যের বাণিজ্যকে উন্মুক্ত করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা" নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। শিরোনামার নিচেই পুস্তিকার পরিচয় লেখা আছে এইভাবে :

"প্রামাণ্য বিষয় এই যে যেহেতু [উক্ত উপায়ে] প্রতি বৎসর রাষ্ট্রের রাজস্ব লাভ হবে ৫০ লাখ পাউণ্ড ও চাঁদা ৮০ লাখ পাউণ্ড, যেহেতু প্রজারা অবাধ বাণিজ্যে তাদের জন্মগত অধিকার ফিরে পাবে এবং করভার থেকে নিস্তার পাবে, সেই হেতু কোম্পানির সনদের মেয়াদ চালু রাখার পক্ষে যে কোন প্রস্তাব আসুক তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত ; এবং যারা এইরকম প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, তারা প্রজা ও রাষ্ট্র উভয়েরই শত্রু বিবেচিত হবে।"

পার্লামেন্টে কোম্পানি স্বার্থের প্রভাব যে কী প্রবল সেই প্রসঙ্গে লেখক বলেন :

"পার্লামেন্টে এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁদের স্বার্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তহবিলের সঙ্গে খুবই সংশ্লিষ্ট ; এবং যেহেতু দেশপ্রেমের চেয়ে তাঁদের আত্মপরতা অনেক বেশি, তাই তাঁরা সম্ভবত যথাসাধ্য **অবাধ বাণিজ্যকে** বাধা দেবেন।"[৫]

যাঁরা কোম্পানির পক্ষে, তাঁরা সামন্তস্বার্থেরই প্রতিভূ :

"পার্লামেন্টে যাঁরা সারা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে যান, তাঁরা সর্বাগ্রে এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই নিজ নিজ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার একটি সাম্প্রতিক প্রমাণ হল জমিদারী কর কমানো।"[৬]

লেখক স্বয়ং যে শিল্পস্বার্থের পক্ষে ওকালতি করছেন তারও প্রমাণ আছে ছত্রে ছত্রে। অভিজাতদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ গোপন করার কোন চেষ্টা না করে তিনি সোজাসুজি প্রস্তাব করেছিলেন যে মোমবাতি, দেশলাই, কয়লা, বিয়ার ইত্যাদি নিত্যাবশ্যক পণ্যে কর বসিয়ে জনসাধারণের দুঃখ না বাড়িয়ে কর বসানো হোক দাস-দাসী, কোচোয়ান, ঘোড়া ও অট্টালিকার মালিকদের উপর ; "আরাম ও বিলাসিতার" উপর এই কর জাতিকে ঋণমুক্ত করবে।[৭]

বাণিজ্যধনবাদের পতনের ইতিহাসে কানিংহাম ১৭৭৬ সালকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] কারণ, ঐ একই সালে একদিকে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা ও অন্যদিকে আডাম স্মিথের "ওয়েল্থ অব্ দি নেশনস" গ্রন্থের প্রকাশের ফলে অবাধ বাণিজ্যের রাষ্ট্রিক ও তাত্ত্বিক জয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিবিস্তার করতে গিয়ে আডাম স্মিথ তাঁর গ্রন্থের একাধিক অধ্যায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারকে যে নির্মম ভাষায় আক্রমণ করেন, বিদ্রূপে ও তীব্রতায় তা কেবল বার্কের বক্তৃতার সঙ্গেই তুলনীয়।

"মনে হয়, একচেটিয়া বৃত্তিই......বাণিজ্যধনবাদী ব্যবস্থার একমাত্র চালিকা শক্তি।"[৯] এই প্রকার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। কারণ, এই ধরনের একচেটিয়া সংগঠন জাতির প্রধান একটা অংশকেই শুধু বাণিজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখে তা নয়, উপরন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য দেশের লোকের কাছে যত চড়া দামে বিক্রি করতে পারে তা

কখনোই অবাধ বাণিজ্য থাকলে সম্ভব নয়। "উদাহরণস্বরূপ, ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তনের সময় থেকে ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীরা বাণিজ্যের সুযোগ থেকে তো বঞ্চিত হয়েছেই, উপরন্তু ভারতবর্ষ থেকে আমদানি পণ্যের ব্যবসায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারজাত মুনাফা তাদের জোগাতে হয়েছে ঐসব পণ্যের ক্রয়মূল্য দিয়ে; তাছাড়া এতবড় একটা কোম্পানির কারবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রতারণা ও অপব্যয়জনিত অস্বাভাবিক অপচয়ের মূল্যও তাদেরই দিতে হয়েছে।"[১০] আডাম স্মিথের মতে তাই, এইসব কোম্পানিগুলি "সব দিক থেকেই একেবারে নির্জলা আপদবিশেষ"—যে দেশের কোম্পানি তাদের পক্ষে যেমন, যে দেশে তার ব্যবসায় সেই দেশেও তেমনি।[১১]

অবাধ বাণিজ্যবাদের এই অভিযানের সঙ্গে তাল রেখেই পার্লামেণ্টের মধ্যেও কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে একটা বিবাদ গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রতিরোধের প্রকাশ দেখা যায় কোম্পানির সনদের মেয়াদবৃদ্ধির বিরোধিতায়। "প্রত্যেক যুগেই সনদের মেয়াদবৃদ্ধির সময় লণ্ডন, লিভারপুল ও ব্রিস্টলের বণিকরা চেষ্টা করেছে কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিকারকে ভেঙে দিয়ে বাণিজ্যের সেই সোনার খনিতে ভাগ বসাতে।"[১২] এই চেষ্টার ফলে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয় ভারতবর্ষ থেকে ও ভারতবর্ষে কিছু কিছু পণ্য আমদানি-রপ্তানি করার। কিন্তু সমগ্রভাবে ধরলে দেখা যায় যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নেবার এই চেষ্টা ১৮১৩ সালের আগে পর্যন্ত তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭৭৩ সালের আইনে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরা যতটুকু বা সুবিধা পেয়েছিল, তার পরিধিও নানা শর্তে একেবারেই সঙ্কুচিত ছিল। দশ বছর পরে ডান্‌ডাসের খসড়া আইনে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের কোন উল্লেখই ছিল না। ফক্‌সের খসড়া আইনে (১৬৭৩) অবশ্য প্রস্তাব করা হয়েছিল যে কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যাপারের অভিভাবক হিসাবে নয়জন সহকারী পরিচালক পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কিন্তু ফক্‌সের খসড়া আইন পার্লামেণ্টের অনুমোদন পায়নি। ১৭৮৪ সালে পিটের ইণ্ডিয়া-অ্যাক্টে কোম্পানির উপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের দাবি বিসর্জন দিয়ে: বলা যেতে পারে যে বাণিজ্যমূল্য দিয়ে সার্বভৌমত্ব খরিদ করা হল। এই অর্থেও ১৭৮৪ সালের

আইন রাষ্ট্র ও কোম্পানির মধ্যে একটা রফার ব্যাপার। ফিলিপ্‌স্ তাই বলেছেন: "কোম্পানির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ তখন এতই পরস্পর নির্ভর ও ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো যে নতুন যে-বোর্ড গড়া হল তাকে বাণিজ্যব্যাপারে মাথা গলাবার কোন অধিকার না দেওয়া একেবারেই অযৌক্তিক হয়েছে।"[১৩]

শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতি সত্ত্বেও ১৭৮৫—এমনকি, ১৮১৫ সাল পর্যন্তও পার্লামেণ্টে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা সম্ভব হল না কেন? তার কারণ, প্রথমত আঠারো শতকের শেষে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বনিয়াদে পরিবর্তন খুব দ্রুত ও গভীরভাবে শুরু হলেও তা তখনও এত প্রবল হয়ে ওঠেনি যে পার্লামেণ্টের পুরানো সামন্ত-তান্ত্রিক চেহারা তৎক্ষণাৎ বদলে দিতে পারে। প্রথম সংস্কার আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত অভিজাত ভূস্বামীদের শ্রেণীস্বার্থই পার্লামেণ্টের অধিকাংশ আসন জুড়ে ছিল; এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে সামন্তস্বার্থের সঙ্গে কোম্পানিস্বার্থের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যে কথা ১৭৬৭ সালের পুস্তিকাটির লেখক বলে গেছেন তা এই গোটা যুগেরই পক্ষে প্রযোজ্য। আঠারো শতকের শেষার্ধের ব্রিটিশ রাজনীতিতেও শিল্পস্বার্থ ও কোম্পানিস্বার্থের বিরোধ ষোলো আনা সুস্পষ্ট নয়। তাই পরবর্তীকালের কবডেনের মতো শিল্পস্বার্থের আপোসহীন প্রতিভূ এযুগের রাজনীতিতে বিরল। এযুগের রাষ্ট্রনেতাদের "টাইপ্" হচ্ছেন পিট্। অবাধবাণিজ্যের নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও তাঁকে ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের অর্থ ও প্রতিপত্তির সাহায্য নিতে হয়েছিল সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য, এবং কোম্পানিপক্ষের সদস্যদের সমর্থন বজায় রাখার জন্যই মন্ত্রিত্ব হাতে নিয়েই ঋণ শোধ করতে হয়েছিল কোম্পানির আমদানি চায়ের উপর থেকে শতকরা ৩৭.৫ ভাগ শুল্ক হ্রাস করে, অর্থাৎ ৬ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব বিসর্জন দিয়ে।[১৪] এমত অবস্থায় পার্লামেণ্টারী উপায়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিকারকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির একাধিকারের মেয়াদ বেশিদিন স্থায়ী হবার একটি প্রধান কারণ এই যে আঠারো শতকের শেষ পঁচিশ বছরে ইংল্যাণ্ডের আভ্যন্তরিক অর্থনীতির অবস্থা অবাধবাণিজ্যের অনুকূল হলেও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা তার প্রতিকূল ছিল। ১৭৭৫ সালে আমেরিকা ও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের শুরু, ১৭৮০-দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের

শুরু, ১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব, ১৭৯০—তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৩—ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ এবং শতাব্দীর শেষ দিকে নেপোলিয়নের আবির্ভাব ও সেই সঙ্গে ইঙ্গফরাসী সংগ্রামের বিশ্বব্যাপী সূচনায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যে সংরক্ষণশীলতা দেখা গিয়েছিল তাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটেছে। এই সাধারণ রাজনৈতিক দুর্যোগের যুগে রাষ্ট্রনেতারা অবাধবাণিজ্যে বিমুখ ছিলেন বলেই রাষ্ট্রস্বার্থ ও শিল্পস্বার্থের মধ্যে এক সাময়িক ও কৃত্রিম বিভেদের আড়ালে আত্মরক্ষা করে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় তার স্বাভাবিক মৃত্যুর তারিখকে কিছুদিন পেছিয়ে দিতে পেরেছিল। একদা অবাধবাণিজ্যবাদী পিট্ এই কারণেই ১৭৮৪ সালে কোম্পানির একাধিকারকে বেশি ঘাঁটাতে চাননি।

শিল্পস্বার্থের রাষ্ট্রজয়

যে কারণে বণিকের মানদণ্ড আপাতত কোম্পানির হাতে রয়ে গেল, ঠিক সেই কারণেই রাজদণ্ডটি তার হাতছাড়া হল।

অখণ্ড বাণিজ্যাধিকারের সঙ্গে অখণ্ড রাজ্যাধিকার যুক্ত হয়েছিল ১৭৫৭ সালেই। অর্থাৎ, কোম্পানি ব্রিটিশ রাষ্ট্রের অধীন হওয়া সত্ত্বেও বিদেশে আরেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপারের পরিণতি খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। ভারতবর্ষে দেশী বা বিদেশী শক্তির সঙ্গে কোম্পানির রাজনৈতিক ব্যবহারে কোন ভুল হলে তার মাশুল গোটা ইংরাজ জাতিকেই দিতে হতে পারে; কোম্পানির লড়াই ব্রিটেনের জাতীয় বিগ্রহে পরিণত হতে পারে; ভারতে ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ফরাসী বা ওলন্দাজ কোম্পানির সম্পর্ক ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স বা হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রিক সম্পর্ককে বিব্রত বা বিকৃত করতে পারে; কোম্পানির শাসনের অব্যবস্থা সমগ্র ইংরাজজাতির মহাকলঙ্কে পরিণত হতে পারে, এবং কোম্পানির অমিতব্যয়িতার ক্ষতিপূরণ করতে হতে পারে ইংরাজ করদাতার পকেট কেটে। বিশেষত ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার পরে অন্য কোথাও আরেকটা মস্ত বড়ো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ক্রমেই আরও ব্যাপকভাবে অনুভূত হতে থাকল।"[১৫] ফলে ভারতে কোম্পানির সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্ন আর কেবল আইনের কূটকচালিতে সীমাবদ্ধ না থেকে পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলাদলি ও প্রচার-পুস্তিকার মারফত এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে পরিণত হল।

ভারতটা কার—কোম্পানির না ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের? এই প্রশ্নের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন:

"কিছু ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ বণিকের যে কোম্পানি টাকার জন্য ভারতবর্ষ জয় করেছিল তারা যখন তাদের ফ্যাক্টরিগুলি বাড়িয়ে সাম্রাজ্যে পরিণত করা শুরু করল, ওলন্দাজ ও ফরাসীর স্বতন্ত্র বণিকদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা যখন জাতিগত রেষারেষি হয়ে দাঁড়াল, তখন থেকেই অবশ্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল, এবং নামে না হলেও কার্যত ভারতবর্ষে এক দ্বৈত শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হল।"[১৬]

কোম্পানির ব্যবসায় স্বার্থের সঙ্গে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার মৌলিক অসঙ্গতির কথা তত্ত্বের দিক থেকে খুব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছিল ১৭৭৬ সালেই আডাম স্মিথের গ্রন্থে। ইউরোপ থেকে যে-সব পণ্য ভারতে আমদানি হয় তা যথাসম্ভব শস্তায় বিক্রি করা এবং ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি পণ্যকে ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা এই হচ্ছে ভারতের সার্বভৌম শাসক হিসাবে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। "সার্বভৌম শাসক হিসাবে, তাদের স্বার্থ আর যেদেশ তারা শাসন করছে তার স্বার্থ হুবহু একই। ব্যবসায়ী হিসাবে, তাদের স্বার্থ উক্ত স্বার্থের ঠিক বিপরীত।"[১৭] ফলে, কোম্পানির বাণিজ্যে যেমন ক্ষতি হয়, তার ভারতীয় শাসনব্যবস্থায়ও তেমনি অযোগ্যতা দেখা যায়। আডাম স্মিথের মতে, তাই, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যসমূহে ব্রিটিশ রাজের, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্র ও জনসাধারণের অধিকারের ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।"[১৮]

ভারতটা সত্যিই কার? ভারতবর্ষ থেকে বহু হাজার দূরে এক বিদেশী বিধান-সভায় এই প্রশ্ন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রনেতা, দল ও মতামতের যে যুগ-যুগব্যাপী সংঘর্ষ ঘটেছে তার মধ্যে একটা হাস্যকর অবাস্তবতা আছে, সেকথা মার্কসের রসিক মনকে এড়ায়নি। প্রায় পঁচাশি বছর-ব্যাপী এই পার্লামেণ্টারী রঙ্গকে ব্যঙ্গ করে তিনি ১৮৫৩ সালে লেখেন:

"শাসন কর্তৃত্ব কার হাতে?—এই প্রশ্ন নিয়ে অ্যারিস্টট্লের যুগ থেকেই ভূরিভূরি রচনার বন্যায় দুনিয়া ভাসানো হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি বেশ মাথা খাটিয়ে লেখা, অনেকগুলি আবার বাজে। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম

দেখা গেল যে ১৩, ৬৮, ১১৩ বর্গমাইল আয়তন জোড়া এক দেশের ১৫,৬০,০০,০০০ অধিবাসীর উপর কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত একটি জাতির সর্বোচ্চ শাসনপরিষদের সদস্যরা অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ অধিবেশনে সমবেত হয়ে এই কুটিল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যস্ত; কী? না,—উক্ত ১৫ কোটি বিদেশীর উপর এই শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী আমাদের মধ্যে কে? ব্রিটেনের শাসন পরিষদে এমন কোনও ঈডিপাস্ তখন কেউ ছিল না যে এই ধাঁধাঁর জবাব দিতে পারে।"[১৯]

১৭৬৭ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানির রাজ্য হরণের চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু কোম্পানি মোটামুটি সরকারকে তার রাজস্বের একটা বখরা দিয়ে এই সমস্যাকে আরও প্রায় পনেরো বছর ধামাচাপা দিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির আভ্যন্তরিক অব্যবস্থার ফলে ইংল্যাণ্ডের জনমত ক্রমেই এত বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা এতই বাড়তে থাকে যে ১৭৮৩-৮৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-সংকটের ধাক্কায় এতদিনের গোঁজামিল দেওয়া রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন হঠাৎ একেবারে জাতীয় প্রশ্নে, একটা গোটা মন্ত্রিসভার থাকা-না-থাকার প্রশ্নে, এবং সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতাদের সামনে পয়লা নম্বর সমস্যায় পরিণত হলো। ১৭৮৩ সালে ফক্স্ তাঁর খসড়া আইনে প্রস্তাব করলেন যে কোর্ট অব্ ডিরেকটরস ও কোর্ট অব প্রোপ্রাইটর্স নামক সংস্থা দুটি একেবারে তুলে দিয়ে ভারতের শাসনভার সমগ্রভাবে ন্যস্ত হোক পার্লামেণ্টের দ্বারা নির্বাচিত সাতজন কমিশনারের হাতে। কিন্তু স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের উদ্যোগে অভিজাততন্ত্রের প্রতিরোধের ফলে এই প্রস্তাব ব্যর্থ হলো। ১৭৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পিট ফক্সের বিলকেই একটু নরমভাবে সাজিয়ে নিয়ে এবং কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ করিয়ে নিলেন, তার দ্বারা ব্রিটিশ সরকার পরোক্ষে কোম্পানির রাষ্ট্রক্ষমতা হরণ করল। পিটের আইনের মধ্যে কোম্পানিস্বার্থের সঙ্গে যে-ভাবে রফা করার চেষ্টা হয়েছে, তার অসাধুতা সম্পর্কে সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা যতখানি বদল করা হয়েছে পিটের আইন মারফত, আগেকার কোনও আইনেই তা হয়নি।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ১৭৮৪ সালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতিতে কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থ ও তার রাষ্ট্রস্বার্থকে যুগপৎ হরণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে, পিট্ যে রকম রফা করেছেন ইতিহাসের বিচারে তা একেবারেই অনিবার্য ছিল। সর্বচেয়ে বড়ো কথা এই যে আপোসরফার সব রকম পিছু-টান থাকা সত্ত্বেও, এবং আপাতত কোম্পানির একাধিকারের কাছে অবাধ বাণিজ্যস্বার্থকে বলি দেওয়া সত্ত্বেও ১৭৮৪ সালের আইন ইংল্যাণ্ডের শিল্পস্বার্থের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জয়। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর হবার ফলে এবং এরই সাহায্যে আরও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক অবস্থার মধ্যেও ব্রিটিশ স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীরা ১৭৯৩ সালে ভারতের বাজারে অবাধ বাণিজ্যের আংশিক সুযোগ লাভ করতে পেরেছিল। এই রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায্যেই ১৭৮৬-৯৩ সালে ভারতে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা বিশেষত, তার ভূমিরাজস্বনীতিকে ব্রিটিশ শিল্পস্বার্থের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা ঠিক যতখানি পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম, ঠিক সেই অনুপাতে দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যও ১৭৮৪ সালের ঐ বিধানই দায়ী।

ক্রমশঃ

---

(১) ফ্রান্সিস্: "লেটার টু লর্ড নর্থ" (ডেব্রেট্) পৃঃ ৪৫ ॥ (২) বার্নাল: "সায়েন্স ইন্ হিস্ট্রি", ৩৬৫-৬৬ ॥ (৩) এঙ্গেল্স্: "দি কণ্ডিশন্ অব্ দি ওয়ার্কিং ক্লাস্ ইন্ ইংল্যাণ্ড" (মার্কস্-এঙ্গেল্স অন্ ব্রিটেন্", মস্কো ৪১ ॥ (৪) কানিংহাম: "দি গ্রোথ্ অব্ ইংলিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ এণ্ড্ কমার্স ইন মডার্ণ টাইম্স্" ২৫৯-৬০ ॥ (৫) "দি অ্যাব্সলিউট্ নেসেসিটি", ৩৬ ॥ (৬) ঐ, ৩৭ ॥ (৭) ঐ, ৬০-৬৩ ॥ (৮) কানিংহাম: ঐ, ২৬২ ॥ (৯) আডাম্ স্মিথ্: "ওয়েল্থ অব্ দি নেশনস্" (২য় খণ্ড), ২৪২ ॥ (১০) ঐ, ২৪২-৪৩ ॥ (১১) ঐ, ২৫৫ ॥ (১২) মার্ক্স: "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ॥ (১৩) ফিলিপ্স্: "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ৩৩ ॥ (১৪) মিল্: "হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" (৪র্থ খণ্ড), ৩৯৩ ॥ (১৫) মার্কস: ঐ ॥ (১৬) মার্ক্স: "দি গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া" ॥ (১৭) আডাম্ স্মিথ্: ঐ, ২৫১ ॥ (১৮) আডাম্ স্মিথ: ঐ ৬২৪ ॥ (১৯) মার্কস: ঐ ॥

কবিতা

সূরজমুখী

বিষ্ণু দে

সূর্য তখন পড়ে গেছে পশ্চিমে—
ওরা কারা করে মৃত্যুর মিহি গান :
বন্দিনী কোন্ সুন্দরী মৃত হিমে
নিথর—করুণ সুরে কারা করে গান !

কয়লাখনিতে সে কান্না ছায়া বাঁধে,
মায়াবী আকাশে স্তব্ধ বাতাসে গান
বলে যায়, সহমরণের মহাসাধে
তাই কি বিশ্ব বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ ?

বিষাদে বিধুর আকাশে তীব্র বোলে
গ্রামের কাতর রাত্রিতে ঘরে ফিরি,
কানে আসে ওকি গ্রাম্য নাচের ঢোলে
আমনের খুশি চাষীদের দেশী গান ?

ওকি গান শুনি ? নাগড়া মাদল ঝাঁঝে
কতো কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি ?
প্রাণ পায় ভোরে মরেছিল যারা সাঁঝে ?
আমি বসে যাই এই পাঠে সহপাঠী।

ভোরে প্রাণ পায়, পুবের পাহাড় জাগে,
পশ্চিমে টিলা কুমারীর স্মিতরাগে
চোখ মেলে, রাঙা নদী চলে ঝিরিঝিরি।
এনে দিলে কোন্ বীর নির্ভয় আসান্ ?

ফিরে এল বুঝি সূরজমুখীর প্রাণ ?
আসানসোলের উষার হাসিতে ফিরি ॥

রাজা চায় তবু আরো !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ছোটো মেয়েটা কচি হাত পেতে পয়সা চায়
দিলুম একটা ফুটো তামা হাতে ফেলে।
মেয়েটা বললে, "জয় হোক বাবা রাজা হও !"
শেখানো কথার সনাতন বিষ ঢেলে।

স্বাধীন দেশের জমকালো এই শহুরে বিষ
মেয়েটা খেয়েছে ডাস্টবিন থেকে তুলে
স্বর্ণচূড়ারা মৃত্যুর ধ্যানে নির্নিমিষ
বিলিতী সুরায় বাররনী সোডা গুলে।

মেয়েটা বললে, "দয়া করো বাবা রাজা হও !"
রাজারাজড়ার মহিমায় হাত পেতে ;
রাজপথচারী পাথুরে মানুষ নির্বিকার
নাকে দড়ি বাঁধা দুরন্ত শহরেতে।

মেয়েটা অবোধ ! জনতাকে ডেকে রাজা বানায়
রাজা হবে তার সময় যে নেই কারো !
পুরোনো রাজারা বেসামাল হয়ে ডোবে খানায়
অভাগী মেয়েটা রাজা চায় তবু আরো ?

উৎসের উদ্দেশে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

দেশের, দশের মাটি, মাটির মমতাময় ঘ্রাণ
বুকে নিয়ে মানুষের বিচিত্র মেলায়, হাটে-ঘাটে,
পথচলার ছন্দে, সুরে, প্রেরণায় করেছি সন্ধান
যাকে, আজো যার ধ্যানে ধরণীর শ্যামলিম মাঠে
ফসলের ফুলে চোখ রেখে, নীল দিগন্তের রঙ
চেয়েছি চোখের হ্রদে, গেঁথেছি শিশিরফুলের মালা।
দীঘল দিনের রোদে সবুজ ঘাসের স্নেহ ঝরে
বিচিত্র বাংলার বুকে, মাটিতে, অরণ্যে অনুক্ষণ !
পাখির নিবিড় কণ্ঠ দিনভোর ছায়ার আসরে
আলাপের তান তোলে ; নদীর কল্লোলে কতো মন
পথে নেমে আসে। দূরে মেঘমুক্ত আকাশের মুখ—
জনমদুখিনী, আহা জননীর মতো চেয়ে আছে,
তার কাছে, তারি কাছে আমার বেদনাবহ বুক
পেতেছি প্রাণের ধারা পাবো বলে। আমি তার মাঝে
শুনেছি ঢেউয়ের গান, কলতান ; হাওয়ার দু হাত
মমতার মতো এসে এ প্রাণের সমস্ত বেদনা
কখন দিয়েছে মুছে। দেশান্তরী স্রোতের প্রপাত
আমার পথের সঙ্গী, যৌবনের দুর্জয় সাধনা !

উৎসের উদ্দেশে আমি তাই নীল সাগরসঙ্গমে
মোহানার মুখ থেকে দূর-দূরান্তের পথে চলি ;
স্নেহশীলা জননীর মতো দেশ, জনমে-জনমে
যাকে জানি, সেই বসুধার বুকে সৃষ্টির কাকলী
ওঠে, ফুল ফোটে, দেখি, পাখির ডানায় হাওয়া নড়ে,
ফল নিয়ে খেলা করে ফসলের সার্থক সন্তান ;
বধূর বুকের ভাঁজে বেদনার অন্ধকার ঘরে
শিশুর সুন্দর মুখ প্রতিদিন প্রতীক্ষার গান
শোনে ; দিন গোনে একা কুমারী প্রাণের প্রজাপতি
ফুলের কুঁড়ির দিকে চেয়ে। দূরে আসন্ন অঘ্রান
আশ্বিনের পথ চেয়ে নতমুখী। আলোর আরতি
সূর্যবন্দনার ভোরে ঘরে ঘরে দৃষ্টির দর্পণে
দেখায় দূরের পথ, শঙ্খ বাজে, নবজাতকের
নীল চোখ নেচে ওঠে প্রসারিত প্রাণের স্পন্দনে।

এই দেশ, মহাদেশ, স্বপ্নের ছবিতে প্রতিদিন
চোখ রেখে চলি। আমি আলোর অঞ্জন ছুঁয়ে হাঁটি ;
পাখি-পাখালির ডাক, গাছ-গাছালির শান্ত ছায়া,
শিশুর, বধূর, কুমারীর চোখ, মায়ের মমতা
আমাকে ঘরের পথে টানে। তাই ঘরেরই সন্ধানে
পথে পথে প্রত্যহের সূর্যকে শোনাই সেই গান,
যে গানে আমার জন্ম, আমাদের জন্মের গৌরব :
ভোরের বরণডালা সাজিয়ে কিশোরকিশোরীরা
বকুল ফুলের গন্ধে গল্প করে, হাসে ; চোখে-মুখে
মৌসুমীর মৃদু হাওয়া, শিউলি ফুলের মতো মুখ,
নদীর স্রোতের মতো আঁকাবাঁকা উচ্ছল হৃদয়।

জানে না, দৈন্যের দীপ কেন জ্বলে-নেভে, কেন আজো
ঝড়ে ঘর ভাঙে, প্রাণ পোড়ে রোদে, আগুনে! প্লাবনে
ভাসে ঘর, বাস্তুভিটেমাটি, ফসলের মাঠ ; ওরা
জানে না বলেই আজো সংসারের শঙ্কাকুল চোখে
আলো আছে, ছায়া আছে ; না হলে নির্মম নীল বিষে
পুড়ে যেতো, ঝরে যেতো প্রাণের সমস্ত স্বপ্ন, সুর!

বহুদূর—বহুদূর থেকে তাই হাওয়া এলে, মন
যেন কার কথা ভাবে, গুনগুন গানের গলা ডাকে
তার নাম ধরে। তবু সে আসে না!—তাই, তারি পথে
প্রত্যয়ের দিকে চলি। কত মানুষের ছায়া পড়ে
নিজের মুখের ভাঁজে, কত প্রাণ দুবাহু বাড়িয়ে
ছুটে আসে ; কতো মুখ : বধূ, বন্ধু, ভগিনী, জননী
পবিত্র প্রাণের দীপ তুলে ধরে : আমি পথ হাঁটি।—

এ পথের শেষ নেই। সামনে নীল স্থবির পাহাড়!
আমি তার শৃঙ্গে উঠে বলিষ্ঠ বাহুতে ঢেউ তুলে
আমার স্বপ্নকে আমি আর সকলের স্বপ্ন দিয়ে
বুকে নেবো কবে! কবে কালের কর্মিষ্ঠা সেই নারী
জীবনের জয়স্তম্ভে যৌবনের রক্তিম ধ্বজায়
আঁকবে মুক্তির ছবি, লিখবে জয়ের ইতিহাস!
আমি তারি প্রতীক্ষায় পথ চলি, আজো পথ চলি……

থানা থেকে আসছি

জে. বি. প্রিস্টলির
'ইন্সপেক্টর কলস'
অবলম্বনে

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

চন্দ্রমাধব সেন	বিখ্যাত ধনী, কয়েকটি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের অংশীদা ও ডিরেক্ট
রমা সেন	চন্দ্রমাধব সেনের স্ত্রী
শীলা সেন	ঐ কন্যা
তাপস সেন	ঐ পুত্র
গোবিন্দ	ঐ ভৃত্য
অমিয়ংবোস	চন্দ্রমাধব সেনের বন্ধুপুত্র
তিনকড়ি হালদার	পদ্মপুকুর থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর
স্থান	পদ্মপুকুরে মাধবচন্দ্র সেনের বাড়ির ড্রয়িংরুম
কাল	১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের এক সন্ধ্যা

প্রথম অঙ্ক

[চন্দ্রমাধব সেনের বাড়ি। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। পর্দা উঠিলে দেখা গেল সোফা, কাউচ ইত্যাদিতে বসিয়া চন্দ্রমাধব সেন শ্রীমতী রমা, শীলা, তাপস ও অমিয় গল্প করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘড়িতে সাতটা বাজে।]

চন্দ্রমাধব। আচ্ছা শীলা বল তো, আজকের টি-পার্টির সবচেয়ে remarkble ব্যাপারটা কি ?

শীলা। কি বাবা ?

চন্দ্রমাধব। :বাঃ—আজকের কাটলেট থেকে আরম্ভ করে পুডিং পর্যন্ত সবই তো তোর মার হাতের তৈরি। করিমের তো আজ সারাদিন ছুটি।

অমিয়। তাই নাকি! তাই প্রত্যেকটা আইটেম অত চমৎকার হয়েছিল —

রমা। (মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে) আচ্ছা তুমি কি বল তো? শীলা-তাপসের সামনে না হয় যা ইচ্ছে তাই বললে—কিন্তু তাই বলে—(মৃদু হাসিয়া অমিয়র দিকে ইঙ্গিত করিলেন)

চন্দ্রমাধব। ও অমিয়? তা অমিয়র সামনে লজ্জা কিসের? ও তো ঘরের ছেলে!

অমিয়। না ·কাকীমা, এ আপনার ভারী অন্যায়। আপনি এখনও আমাকে পর বলে মনে করেন ?

তাপস। সত্যি মা, তোমার ভারী অন্যায়! শেখরকাকার টেলিগ্রাম, চিঠি, দুই এসে গেছে—

শীলা। বাঃ—শুধু তাই? আজ বিলিতি মতে এন্‌গেজমেন্ট হয়ে গেল—সাত দিন বাদে দিশী মতে পাকা-দেখা—

তাপস। শুধু পাকা-দেখা? এক মাস বাদে বিয়ে—

অমিয়। না না তাপস,—বাবার চিঠি, টেলিগ্রাম, বিয়ের দিন ঠিক হওয়া, এসব না হয় আজকালের ব্যাপার। আগের কথাটা ধর। কাকাবাবু বাবার ছোটবেলার বন্ধু, ছোটবেলা থেকে আমার এখানে আসা-যাওয়া। মাঝে যে ক ·বছর বিলেতে ছিলাম, সেই ক বছরই যা আসতে পারিনি। নইলে দেখ, ফিফ্‌টি ওয়ানের ডিসেম্বর ফিরেছি—আজ তিন বছর হতে চলল—নিয়মমতো এ বাড়িতে আমার আসা-যাওয়া—

শীলা। উহু—অঙ্কে ভুল হয়ে গেল! ফিফ্‌টি থির মে-জুন জুলাই· এ বাড়িতে তোমার টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় নি—

অমিয়। বারে আমি তোমাকে বলিনি—ফ্যাক্‌টিতে ভীষণ কাজ পড়েছিল—

শীলা। না না.—বলনি,—সে কথা কি আমি একবারও বলেছি? দেখলাম, হিসেবে ভুল করছ—তাই মনে করিয়ে দিলাম।

রমা। এ তোর ভারী অন্যায়, শেলী! বেচারীকে ভাল-মানুষ পেয়ে শু শুধু জ্বালাতন করা! কাজের চাপে দু-তিন মাস যদি নাই আসতে পারে পুরুষ-মানুষের কাজের তুই বুঝিসটা কি? ওদের কত কাজ—

চন্দ্রমাধব। নিশ্চয়। শেখর তো আজ দু-বছর হল সব ওরই ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

রমা। তবে? (শীলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—'কিন্তু মা'—তাহাকে বাধা দিয়া) আচ্ছা, তুই কি ভাবিস বল তো শীলা? বিয়ের পর দিনরাত ও তোর আঁচল ধরে ঘরে থাকবে? ও একজন বিজনেসম্যান্! সব সময় দেখবি কাজের চাপে, বাড়িঘর কোন কথাই ওর মনে নেই না— তুই ধারণা বদলাতে চেষ্টা কর শেলী—

শীলা। চেষ্টা করে দেখেছি মা—পারিনি! আর কোন দিন যে পারব তা তো মনে হয় না। অতএব অমিয়বাবু, তুমি এখন থেকে সাবধান (তাহার এই শেষের কথাগুলি শুনিয়া, দুই রকমই মনে হইতে পারে মনে হইতে পারে, হয়তো সে অমিয়র সহিত রসিকতা করিতেছে—কিন্তু হয়তো সত্য সত্যই তাহাকে সাবধান হইতে বলিতেছে)।

অমিয়। না না তুমি দেখে নিও শীলা—ঐ একবারই যা হয়ে গেছে— (কোথাও কিছু নাই অমিয়র কথা শুনিয়া তাপস হঠাৎ জোরে হাসি উঠিল। মিঃ ও মিসেস সেন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন।)

শীলা। উঃ হেসে লুটিয়ে পড়লেন একেবারে। কেন, কিসের এত হাসি শুনি?

তাপস। (তখনও অল্প হাসিতে হাসিতে) তা তো জানি না—হঠাৎ কি রকম হাসি পেয়ে গেল—

শীলা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) তা তো পাবেই! হাসি পাবার মতো কথা বল আমরা—আর উনি হেসে আমাদের তুড়িতে ফুঁ করে দিলেন!

তাপস। না কক্ষনো না—আমি কোন কিছু ভেবে হাসি নি—

রমা। আঃ—আবার দুজনে ঝগড়া আরম্ভ করলি! আর শীলা, তোকে বলি! কি সব কথাবার্তা বলছিস আজকাল? তুড়িতে ফুঁ করে দিলেন কোথেকে শিখছিস এসব?

তাপস। তুমি বোধহয় ওর কথাবার্তা বিশেষ কান করে শোন না মা—আজকাল ও ওইরকম কথাই তো বলে—

শীলা। দেখ মা—আমি কারুর মান-টান রেখে কথা বলতে পারব না বলে দিচ্ছি! ছোড়দাকে ও রকম গাধার মতো কথা বলতে বারণ করে দাও—

তাপস। দেখ শীলা—

রমা। (বাধা দিয়া) আঃ তোরা থামবি কিনা! দু-জনে দেখা হবার জো নেই একেবারে! দেখা হলেই ঝগড়া! (শীলাকে) আর ঝগড়া তো খুব করছিস? আজকের দিনে বাবাকে যে একটা প্রণাম করতে হয়, সে কথাটা মনে আছে কি?

শীলা। ঐ যাঃ—একেবারে ভুলে গেছি! (উঠিয়া মিঃ ও মিসেস সেনকে প্রণাম করিল—সেই সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ও প্রণাম করিবার সময় মিঃ সেনকে 'থাক বাবা থাক, হয়েছে হয়েছে'—বলিতে শোনা গেল।)

চন্দ্রমাধব। (রমাকে) বুঝলে, ওরা ভাবছে, আজ ওদেরই দিন। তোমার আমার কথাটা তো জানে না! শীলার সঙ্গে অমিয়র বিয়ে—এ আমাদের কতদিনের ইচ্ছে! অমিয় যখন বিলেতে, তখন থেকে কথাবার্তা চলছে। এ বছর হবে সমস্ত ঠিক। এমন সময় শেখর বৌকে নিয়ে চলে গেল বম্বে। ভাবলাম এ বছরও হল না। তারপর হঠাৎ কাল শেখরের টেলিগ্রাম— সামনের শনিবার পাকা-দেখা, সব ব্যবস্থা কর, আমি যাচ্ছি।

রমা। ওঃ—কাল যদি টেলিগ্রাম পাবার পর আমাদের অবস্থা দেখতে! কি যে করব, কাকে যে বলব, যেন কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না! আমি তো বলেছিলুম, আমাদের সার্কলের সবাইকে আজকের পার্টিতে বলা হোক—

চন্দ্রমাধব। সেটা আমিই বারণ করেছিলাম অমিয়! আচ্ছা তুমিই বল, আজকের এই যে ঘরোয়া ব্যাপার—এটাই বেশ চমৎকার হল না?

অমিয়। না না, কাকীমা, এটা খুব ভাল হয়েছে। শনিবার একটা পাব্লিক কিছু করলেই হবে।

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, তারপর কি যেন বলছিলুম—? ও, হ্যাঁ—শেখর আর আমি আজই আমরা ফ্রেণ্ডলি রাইভাল্স্—কিন্তু একমাস বাদে? তখন আমরা আত্মীয়। সত্যি আজ আমি স্বপ্ন দেখি অমিয়—শেখর আর আমি এক

হয়ে গেছি। অবিশ্যি শেখরের কনসার্ন আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক পুরনো—তা হোক, তবু আমার মনে হয়, দুই মিলে এক হবেই! বিরাট বিজনেস ট্রাস্ট গড়ে উঠবে—নাম হবে ধর, চন্দ্র-শেখর নগর, কি শেখর-মাধব নগর—ট্রেড মার্ক হবে, এনভিল আর হ্যামার! (উত্তেজিত হইয়া) তখন আর আমরা রাইভ্যালস নই অমিয়, তখন আমরা এক হয়ে কাজ করছি—for lower costs and higher prices!

অমিয়। And for more profits! আমার মনে হয় বাবাও এতে রাজী হবেন কাকাবাবু।

রমা। আচ্ছা, তুমি যেন কি! আজকের দিনে আর কথা পেলে না? সেই বিজনেস্, বিজনেস্ আর বিজনেস্!

শীলা। সত্যি বাবা—কোথায় সানাই বাজবে না তোমরা দুজনে খেরো খাতা নিয়ে বসলে!

চন্দ্রমাধব। না না, ও আমি এমনি কথার কথায় বলছিলাম। কিন্তু যাই বল রমা—শীলা, অমিয়, এরা সত্যিই ফরচুনেট—

অমিয়। (শীলার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া) অন্তত আমি যে ফরচুনেট এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই!

রমা। (অল্প তর্জনের স্বরে) কিন্তু শীলা—

শীলা। কি হল মা? আবার কি করলুম?

রমা। বাঃ—কি করলুম মানে? (তাপসের দিকে ইঙ্গিত করিলেন)

শীলা। (ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া) ঐ দেখ একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম! (তাপসকে প্রণাম করিয়া) আজকের দিনে তুই আমায় মাফ কর ছোড়দা—

তাপস। (শীলার হাত ধরিয়া উঠাইয়া) দূর পাগলি! মাফ কিসের? তুই কি কোন দোষ করেছিস, যে মাফ করব? বুঝলে অমিয়—শীলা একটু বদ-মেজাজি বটে, কিন্তু এরকম মেয়ে হয় না—

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁগো শীলার এ আংটিটা নতুন গড়ালে বুঝি? বেশ চমৎকার হয়েছে তো!

রমা। আমি গড়াব কেন? ওটা যে অমিয় আজ শেলীকে প্রেজেন্ট করেছে—

চন্দ্রমাধব। বাঃ, বেশ হয়েছে! শেলী—মাই গার্ল। সত্যি এ একটা বিয়ের

মতো বিয়ে হচ্ছে, কি বল। আমার মেয়ে শেখরের ছেলে! পরে তুমি আমার কথা মিলিয়ে নিও—এ বিয়েতে ওরা দুজনেই খুব সুখী হবে! হ্যাঁ, কিন্তু একটা কথা—(শীলাকে তখনও আঙুলের আংটির দিকে দেখিতে দেখিয়া) ওরে শোন শোন কথাগুলো শুনে রাখা তোরও দরকার—আজ বাদে কাল একটা ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালিস্টের বউ হতে চলেছিস—

শীলা। না না, তুমি বল বাবা—আমি শুনছি—

চন্দ্রমাধব। না—মানে ঐ যে বলছিলুম না—সত্যিই তোরা খুব সুখী হবি! আর কেন হবি না বল? সত্যিই খুব ভাল সময়ে তোদের বিয়ে হচ্ছে! তুমিই বল না অমিয়, সময়টা কি এমন খারাপ! বাইরে অবিশ্যি দু-চার জন লোকের মুখে সব সময়েই শুনতে পাবে—বাজার মন্দা, সময়টা বড্ড খারাপ! কিন্তু আমিও তো একজন দুঁদে বিজনেস্‌ম্যান? আমি আমি তোমায় বলছি অমিয়, ওসব কথার কোন মানেই হয় না! যারা কোন কালে কিছু করতে পারে না তারাই ঐ সব কথা বলে! আরে এখন তো সময় ভাল যাচ্ছেই, এরপর আরো ভাল সময় আসছে। বাইরে অবিশ্যি ঐরকম দু-চারজনের মুখে শুনতে পাবে—কোথায় সময় ভাল? আজ অমুক মিলে স্ট্রাইক, কাল তমুক ফ্যাক্‌ট্রিতে কাজ বন্ধ। ঐ যে—ওমাসে জেনারাল স্ট্রাইক না কি একটা হল না—আরে সে কি হৈ-চৈ! এইবার লেবার-ট্রাবল আরম্ভ হল—আর রক্ষে নেই—হেন-তেন সাত-সতের সে সব আরো কত কি! আরে, যতই যাই হক—ফরটি-সিক্সের মত তো আর হবে না! কিন্তু, কই কিছু হল কি? রায়ট বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় ভেসে গেল ইন-কিলাব-জিন্দাবাদের দল! তারপর আমরা এমপ্লয়াররাও তো কিছু চুপ করে বসে নেই! আমরাও দেখছি যাতে ক্যাপিটালের ইন্টারেস্ট প্রপারলি প্রটেকটেড হয়! আমি তোমায় বলছি অমিয়, আমাদের এখন ধনস্থানে বৃহস্পতি—ফল সম্ভোগ, অর্থ-বৃদ্ধি—বুঝলে—

অমিয়। আমারও তাই মনে হয় কাকাবাবু—

তাপস। আর পাঁচজনে কিন্তু অন্য কথা বলছে। তারা বলছে বিপ্লব, শ্রেণী-সংগ্রাম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ—আরো সব কত কি!

চন্দ্রমাধব। থামো থামো! বিপ্লব, শ্রেণী-সংগ্রাম! সব অত শস্তা ক্লি মাঠে ময়দানে, দু-চারটে মিটিঙে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ইন-কিলার্ব, ই কিলাব করলে যদি বিপ্লব আসত, তাহলে আর ভাবনা থাকত না আগে দেখ লোকে কি চায়? এদেশের লোকের প্যাসিভ নেচার তারা ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবে কেন? ওসব হাঙ্গামায় তাদে লাভটা কি? আর বুদ্ধিমান লোক তো মোটেই ওসবের মধ্যে যাবে না তারা এ বাজারে বেশ পয়সা করে খাচ্ছে! তোমার আমার মতে নরম্যাল লোকের ওসব ঝঞ্ঝাট করে লাভ তো কিছুই হবে না— বরং লোকসান! এক লাভ হতে পারে কাদের—যারা অ্যাব-নরম্যাল অকর্মা, বেকার তাদের! কিন্তু তাদের সে শক্তি কই? সে ক্ষমত কোথায়?

তাপস। সব বুঝলাম—কিন্তু তবু—

চন্দ্রমাধব। আবার তবু কিসের শুনি, তবু কিসের? তোদের ধরনই এই! জানিস তো কত—কিন্তু তবু দেখ সব কথায় একটা করে তবু-কেন-কিন্তুর ফোড়ন আছেই! ওরে বাবা, আমিও তো একটা দুঁদে বিজনেস-ম্যান আমার কথারও তো একটা দাম আছে! দুনিয়াটার দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখ how fast it is developing যারা একটু বুদ্ধিমান, একটু চিন্তা করে, তাদের এখন ওসব কথা ভাববার সময় কই! এটা কি উনিশ শো আঠারো সাল—না রাশিয়া! জীবনের কমফর্টস, লাক্সারি, কত বেড়ে গেছে এখন! এই চোখের ওপর দুর্গা মিত্তিরকেই দেখছি। ছিল একটা পেটি বিজনেস-ম্যান। যুদ্ধের বাজারে দুটো পদে ব্যাবসা আরম্ভ করলে, দিশী পদে চাল আর পুরনো লোহা, আর আর বিলিতি পদে বীফ। দুদিনে একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ। যা একটু বাকি ছিল ব্যাঙ্কটাকে ফেল করিয়ে তাও পুষিয়ে নিলে। প্রথম প্রথম সব্বাই নাক সেঁটকাত। আজ? আজ সে আমাদেরই একজন। কে বলবে সে একদিন বীফের ব্যাবসা করত! গোহত্যা নিরোধের আজ সে একজন বড় পাণ্ডা! এই তো পরশু প্রসেশনের সঙ্গে মোটরে করে গেল তারপর মোটর থেকে নেমে গিয়ে পুলিশের লাঠি খেলে। আগে একখানা ভাঙা ফোর্ড ছিল—এখন দেখ

চারখানা নতুন মডেলের গাড়ি। আগে কোন রকমে সেকেণ্ড ক্লাসে ট্রাভেল করত, এখন প্লেন ছাড়া কথা বলে না। এই তো কালই বলছিল—ছাতে প্লেন নামাতে পারলে ভারী সুবিধে হয়! আরে, এখন কি দেখছিস? আবার তাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে যখন পার্টি দিবি, তখন দেখবি—লোকে দিব্যি আরামে রয়েছে, চারধারে র‍্যাপিড প্রগ্রেস, মালিকেরা সব এক জোট, লেবার ট্রাবলের কোন চিহ্নই নেই! দেখবি প্রত্যেকটা দেশ তখন আমেরিকার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে—অবিশ্যি রাশিয়া, চীন-ফিন্ বাদে! ওসব জায়গায় আজও ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, সেদিনও থাকবে না—কাজেই নো প্রগ্রেস।

রমা। (বিরক্ত হইয়া) আচ্ছা, তোমার আজ কি হয়েছে বল তো? আবার আজকের দিনে ঐ সব বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে—

চন্দ্রমাধব। না মানে—

রমা। না, কোন মানে নয়, চুপ একেবারে।

চন্দ্রমাধব। আচ্ছা আচ্ছা, এই চুপ করলাম—হয়েছে তো! কিন্তু না বলেই বা কি করি বল? বাইরে তো ঘুরতে হয় না, ঘুরলে দেখতে পেতে! যত ব্যাটা হতভাগা, অকর্মার দল! কেউ নাটক লেখেন, কেউ লেখেন গল্প-কবিতা, কেউ বা খুচরো পলিটিক্স করেন! আর সব কথা বলছে কি! শুনলে মনে হবে দেশের নাড়ীনক্ষত্র সবকিছু জেনে বসে আছে একেবারে! আরে দেশের বুঝিসটা কি? জীবনের দেখলি কি? ক্যাপিটাল আমাদের, বিজনেস আমাদের! যেটুকু বোঝবার, সেটুকু তো আমরাই বুঝি! তুমি কথা বলার কথা বলছ? এতদিন তো চুপ করেই ছিলাম। আজ ওরা আবোল-তাবোল বকছে বলেই না আমরা একটু-আধটু বলছি। অন্তত এটা তো ঠিক কথা—আমরা যেটুকু বলব, তা সলিড এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলব—ওদের মতো আবোল-তাবোল নয়!

(গোবিন্দর প্রবেশ)

গোবিন্দ। মা, স্যাক্‌রা এসেছে, তাকে কি এখানে নিয়ে আসব?

রমা। না, ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা, আমি যাচ্ছি। চল শীলা, প্যাটার্ন আর ডিজাইনটা পছন্দ করে দিবি চল—অমিয়, চলে যেও না যেন

বাবা, আমরা এখুনি আসছি—(অমিয় 'না না আমি আছি কাকীমা' বলিলে, মিসেস সেন ও শীর্ণা উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তাপসকে) তুই একটু আয় তো তাপস, দরকার আছে। (তাঁহাদের পশ্চাতে তাপসের প্রস্থান।)

(তাঁহারা চলিয়া গেলে চন্দ্রমাধব সিগারেট কেস হইতে সিগারেট ধরাইলেন)

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, একটা কথা অমিয় অবশ্যি তোমার আমার মধ্যে! আমি যত দূর জানি, তোমার মার বোধহয় বিশেষ মত ছিল না এ বিয়েতে—তাঁর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল স্যার এ এনের নাতনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়—তাই না? (অমিয়কে 'না মানে না মানে' বলিতে দেখিয়া) না না, আমি বলছি না তাঁর অন্যায়। শেখর আমার বন্ধু হতে পারে—কিন্তু ঘর হিসাবে তোমরা আমার চেয়ে অনেক বড়: বিশেষ করে তোমার মা তো স্যার বীরেন মিত্তিরের মেয়ে। তবে আমারও পোজিশন খুব একটা নিচু এখন নয়। বার দুয়েক বিলেতও ঘুরে এসেছি—আর অনর্স-লিস্ট এখন নেই তাই—থাকলে স্যার না হলেও একটা রায় বাহাদুর—অন্তত হতুম। তবে একটা ভরসা আভাসে তোমার মাকে দিতে পার—এবার বোধহয় অ্যাসেম্বলিতে যাচ্ছি—

অমিয়। তাই নাকি?

চন্দ্রমাধব। হ্যাঁ, রিসেণ্টলি ভূপেন মিত্তিরের সিট খালি হয়েছে না? ঐ সিটে—

অমিয়। বাঃ—ফিরে এলেই মাকে আমি খবরটা দেব—

চন্দ্রমাধব। না না, এখনও সেণ্ট পারসেণ্ট সার্‌টেন্ নয়—তবে তুমি তোমার মাকে বলতে পার। নমিনেশনটাও জাঁদরেল ব্লকের আর এলাকাটাও ভাল! বেশির ভাগ ভোটারই ব্যবসাদার—খালি গোটা দুয়েক বস্তি আছে। কিছু যদি ভাঙাতে পারি, আর মনে হয় পারব—তাহলে আর দেখতে হবে না—ইলেক্‌শন সার্‌টেন্!

অমিয়। তাহলে, মাকে খবরটা পরিষ্কার জানিয়েই দিই, কি বলেন?

চন্দ্রমাধব। না না, বলা কি যায়! ধর শেষ পর্যন্ত একটা স্ক্যাণ্ডালই হয়ে গেল—কোর্ট ঘর করতে হল—

অমিয়—শুধু শুধু স্ক্যাণ্ডালই বা হতে যাবে কেন?

চন্দ্রমাধব। তা কি বলা যায়? চারদিকে কত পুয়োর রিলেশন্স্! কখন কে কি কুকর্ম করে বসে তার ঠিক কি? তুমি বরং তোমার মাকে হিণ্ট দিয়ে রেখ—(তাপসকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) কিরে, তোকে যে তোর মা দরকার বলে ডেকে নিয়ে গেল?

তাপস। দরকার না ছাই। স্যাক্‌রা ডিজাইন-বুক দিয়ে চলে গেল, আর ওঁরা শাড়ি-জজেটের কথা আরম্ভ করলেন। আমায় যে দরকার বলে ডেকে এনেছে, সে হুঁশই নেই কারুর! আমি একটা মজা দেখেছি বাবা, মেয়েরা কাপড় আর গয়নার কথা যখন আরম্ভ করে, তখন বিশ্ব সংসার ভুলে যায়!

চন্দ্রমাধব। কিন্তু কাপড় আর গয়নাটা তোদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু ওদের কাছে নয়। তুই কি ভাবিস, মেয়েরা তাদের সুন্দর দেখাবে বলেই ওসব নিয়ে এত মাথা ঘামায়? কাপড় আর গয়না ওদের সেল্‌ফ্-রেস্‌পেক্টের একটা চিহ্ন, তা জানিস!

অমিয়। ঠিক বলেছেন আপনি—

তাপস। (ব্যস্তভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও মনে পড়েছে—(থামিয়া গিয়া) না—মানে—

চন্দ্রমাধব (বাধা দিয়া) না মানে? না মানে কি? কি মনে পড়েছে তোর?

তাপস। (অপ্রতিভ হইয়া গিয়া) না—মানে—ও কিছু নয়—এমনি বলছিলুম—

অমিয়। (ঠাট্টা করিয়া) উঁ-হু তাপস, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে—

চন্দ্রমাধব। তা যা বলেছ—কিছু বিশ্বাস নেই এদের! হাতে অবসরও প্রচুর, টাকাও প্রচুর। কাজেই কখন যে কি করতে পারে, আর কি করতে পারে না—তা জোর করে কিছু বলা যায় না। অথচ আমাদের ছোট বেলার কথা মনে আছে—বাড়িতে এক মিনিট বসে থাকতে সময় পেতুম না! কিছু না থাকলে ঘরে কাজ করতে হত। আর টাকা-পয়সা? মনে আছে যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তে যেতাম, তখন বাসভাড়া আর জলখাবার মিলিয়ে দশটা করে পয়সা পেতাম। কিন্তু কেমন চলে যেত আমাদের—আবার ওরই মধ্যে একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদও করেছি—

অমিয়। তা তো করতেই হবে—একটু আমোদ-আহ্লাদ না করলে চলবে কেন?

চন্দ্রমাধব। সেই কথাই তো বলছি! তাপস ভাবছে, আমি আবার হয়তো বক্তৃতা শুরু করব। কিন্তু বক্তৃতা কোথায়—এটা একটা দরকারী কথা। কথাটা তোমাদের কারুরই মনে থাকে না—বোঝও না বোধ হয় তোমরা। আজকে তোমরা যা পাচ্ছ -এ তো তৈরি জিনিস। কিন্তু আমরা তা পাইনি—আমাদের তৈরি করে নিতে হয়েছে। তোমাদের এগিয়ে যাওয়া কত সহজ—কিন্তু পারছ কই তোমরা আমাদের মতো এগুতে? কেন পারছ না জান? ঐ দরকারী কথাটা কেউ বোঝ না বলে। জানবে আজকের দিনে বড় হতে গেলে দুনিয়ায় নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখবার নেই। জেনে রেখ—first you yourself, second you yourself, and last you yourself! অবিশ্যি ফ্যামিলি থাকলে ফ্যামিলির কথাটাও কন্‌সিডার করতে হবে। এই সেল্‌ফের নীতি-কথাটি যদি মনে থাকে, তবেই দেখবে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ। আর নইলে বাইরের ঐ সব মাথাখারাপ হতচ্ছাড়াদের কথায় কান দিয়েছ কি মনে হবে - উঁ-হু, সেল্‌ফ তো ঠিক কথা নয়, সমাজের সকলের সুখ-দুঃখ দেখতে হবে। আর যত সব নন্‌সেন্স্ কথা মনে আসবে—সমাজ, রাষ্ট্র, কো-অপারেশন, ব্রাদারলি ফিলিং!—আর ঐ সব মনে হয়েছে কি তলিয়ে গেছ! আরে বাবা—আমি একটা দুঁদে বিজনেসম্যান, অভিজ্ঞতার পাঠশালায় আমার পড়া নেওয়া! আমি তোমাদের বলছি—দুনিয়ার কোন লোকের জন্য এতটুকু দায় তোমাদের নেই! খালি নিজেকে দেখ, নিজের ফ্যামিলিকে দেখ। আর তেল যদি দেবার দরকার হয়—দাও তেল—কিন্তু নিজের চরকায়।

[ক্রমশ

আকাশ মাটি

মানসী মুখোপাধ্যায়

॥ চার ॥

কলেজ খোলার কিছুদিন পরে রেবার বাবা অন্যত্র বদলী হয়ে গেলেন। যাবার সময় রেবাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। রমেশবাবু ওদের অনুসরণ করলেন।

এম. এস. সি. পড়ার চাপে এমন ডুবে গেলুম যে ওদের খবর নিয়মিত রাখতে পারলুম না। মাঝে মাঝে এর ওর কাছ থেকে ভাঙা-ভাঙা খবর পেতুম—ওরা দুইটিতে তেমনই আছে। রমেশবাবুর বিয়ের খবরে রেবা প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। পরে একের প্রতি অপরের সহানুভূতি ও নির্ভরতা ওদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। রেবা আবার গানে গানে দিনগুলি ভরিয়ে তোলে। রমেশবাবু তেমনই আঁকেন। ওরা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও মনোমত স্বপ্ন-জীবনকে মাটির বুকে গড়ে তুলেছে।

শেষের দিকে ওদের খোঁজ ছিটেফোঁটাও রাখতে পারতুম না। আকস্মিক আঘাতে মনের এমন ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল যে তখন আমারি কেউ খোঁজ খবর নিয়ে রূঢ় বাস্তব থেকে আড়াল করে রাখলে বেঁচে যেতুম।

কোমর বেঁধে শেষে নিজেই নিজের জন্য উঠেপড়ে লাগলুম। দাদা অবশ্য আপত্তি তুলল। বললে—মা না হয় গেছেন কিন্তু আমরা তো আছি।

হেসে উত্তর দিলুম—কে বললে তুমি নেই। তুমি আছ, বৌদি আছে, আর ঐসব ট্যাবা টোবা ভাইপো-ভাইঝিরা আছে, সবাই আছে। আমি এটা করছি শখের বশে। একনাগাড়ে পড়ার পর এই তো প্রথম ছুটি পেলুম, একটু বেড়িয়ে আসি। আর সেইজন্যে কোন কিছু করে যদি নিজের হাত খরচাটা জোগাড় করে নিতে পারি তো মন্দ কী?

দাদা অল্প কথার মানুষ। যেটুকু বলে তার বেশির ভাগ কলেজে খরচ হয়ে যায়। বাকিটুকু বৌদির কানে ব্যবস্থামত বর্ষণ করায় পর আমাদের জন্য আর বেশি কিছু অবশিষ্ট থাকে না, কাজেই আমার কথায় চুপ করে গেল। আমি নিজেকে মুক্ত বুঝে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে একদিন কানপুরের টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলুম।

এতদিন নিজে পড়ে এসেছি। এবার যাচ্ছি একটি মেয়ে-কলেজে পড়াতে। এ একেবারে অন্য জগৎ, অন্য অভিজ্ঞতা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে টলতে টলতে মনে মনে তারই মহড়া দিতে লাগলুম।

টঙ্গা করে যেতে যেতে গরমে অস্থির হয়ে উঠলুম। বাংলাদেশ এখন মেঘগলা জলের ধারায় স্নান করে সবুজ ওড়না জড়িয়ে হাসছে। আর এ দেশ! মনে হয় যেন কোন্ নির্দয় মানুষের সীমানায় এসে পড়েছি। দেহে তার সন্ন্যাসীর রুক্ষতা আর চোখে বন্দীর নিষ্ফল আক্রোশ।

ঠিকানা মিলিয়ে কলেজে এলুম। প্রথামতো নিয়ম-কানুনের হাঙ্গামা চুকিয়ে বাইরে আসতেই তিনজনে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। এঁরা এই কলেজে পড়ান। আমারই মতো বাইরে থেকে এসেছেন। কলেজের হস্টেল বিল্ডিং শেষ হয়ে ওঠেনি। ওঁরা কয়েকজন মিলে মেস করে আছেন। আমি এসে দল বাড়ালুম।

কুমারী শোভনা সেন, কুমারী লতিকা রায়, কুমারী জয়া চৌধুরী ও আমি ঐ একই টঙ্গা করে মেসে চললুম।

তিনজনের মধ্যে দুজন সংযত আলাপী আর একজন বে পরোয়া বাক-বাগীশ। শোভনা ও লতিকাকে যদি বলা যায় নদী তো জয়া হল ঝরনা। কিন্তু কারুর মধ্যে নদী বা ঝরনার মাধুর্য নেই, আছে বঞ্চিতের মুখোসহীন কঠিনতা।

টঙ্গাতে হল পরিচয়, মেসে এসে হল বন্ধুত্ব আর দিবানিদ্রা সেরে সন্ধ্যে-বেলা চা খেতে বসে দেখি সবাই 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছি।

নতুনের প্রতি আমাদের একটা মোহ আছে, নতুন মানুষের প্রতিও। নয়তো ওদেরই মতো একজন সুদূর স্বপ্ন-বিলাসিনী, সে হয়তো একদিন ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য ওদের এত মাথাব্যথা কেন।

সংযতভাষিণীরা আগামী রবিবারে নতুন মানুষটিকে নিয়ে বিশেষ দর্শনীয়

বস্তু দেখবার প্রোগ্রাম তৈরী করছিল। জয়া এসে সব উলটে দিয়ে বলল—কাল নয় আজই চল।

আমি তৈরী ছিলুম। ওঁরা তৈরী হতে গেল। সেই ফাঁকে এঘর ওঘর করে বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ালুম। এ যে রেবা-রমেশের ছবি! এখানে এলো কী করে?

উড়ন্ত আঁচলে টান পড়তে ফিরে দেখি জয়া পেছনে দাঁড়িয়ে অর্থসূচক হাসি হাসছে।

তার শরীরে কোথাও উঁচু-নিচু পাবার জো নেই। যেন একটা কাঠের পাত সামনে দাঁড়িয়ে। সেটাকে জড়িয়ে টান-করে-পরা শাড়ি ভাঁজে ভাঁজে উঠে পিঠে ঝুলছে; টান করে চুল বাঁধা। সবকিছু যেন সে টেনে ধরে রেখেছে নীরস আবেশে।

চোখোচোখি হতেই মুখরা মুখ খুলল—তাই বল। আমি ভাবলুম রেবারই তো বান্ধবী, কোথায় কর্পূর হয়ে উবে গেল বুঝি বা। তা যুগল-মিলন কেমন লাগল?

এক ঘণ্টার মধ্যে ওর যা পরিচয় পেয়েছি তাতে বুঝেছি হুল ফুটিয়েই ওর আনন্দ। এদের কথায় রাগ করে লাভ নেই। হালকা হই। বলি—তুমিও তো দেখলে পেছন থেকে দাঁড়িয়ে। কেমন লাগল বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমি ভাবছি এ ফটো এখানে এলো কী করে? আর আমি যে রেবাকে চিনি এ তুমি কেমন করে জানলে?

—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কথার সঙ্গে সঙ্গে সাপের মতোই সে লকলকিয়ে ওঠে। ওর তিরিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবন তার দীনতা নিয়ে বাচনে, ব্যবহারে, ভাবে, ভঙ্গিতে বড়ো বেশি প্রকট।—আরে এখানে ও ফটো এলো যেহেতু একদিন শ্রীমতী এখানে রাস-লীলা করে গেছেন।

—রেবা এখানে ছিল?

—হ্যাঁ গো, তুমি তো তার জায়গাতেই এসেছ।

—সে কোথায় এখন? কথা শেষ করতেই খলখল শব্দে কুৎসিত হাসি কানে এলো।

আসলে জয়া জানাল—এ রাধা আমাদের মডার্ণ। পরিবর্তনশীলতার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। ঐ আয়ান ঘোষের বউয়ের মতো ঐ এক কেষ্ট,

যমুনার পথ আর গাগরীর ছলনাটুকু নিত্যকালের জন্য 'দি বেস্ট' বলে ডিক্লেয়ার করেনি।

—মানে ?

—কিসের মানে খুঁজছ রীতি ? সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায়। তারপর জয়াকে দেখে বলল—ওর পাল্লায় পড়েছ বুঝি, হয়েছে আজ বেড়াতে যাওয়া।

—থাম, কী বলছিলে জয়া ?

—বলছিলুম এ জীবন মহানাট্যশালা। যথাসময়ে তোমায় নব নব দৃশ্য-পরিবর্তন দেখাব। এখন 'ইণ্টারভ্যাল'। এ সময়ে তোমাকে আমাদের সঙ্গে বায়ুসেবন করতে অনুরোধ করি। কথার শেষে তার টান-টান শরীরটাকে ভেঙে কুর্নিশ করে চলার ইঙ্গিত জানায়।

তার কাণ্ড দেখে সবাই স-শব্দে হেসে ওঠে। আমিও হাসি। বলি—বায়ুসেবন করাবার আগে বাক্যসেবন করিয়ে যে পেট ফুলিয়ে দিলে তার কী হবে ?

—রাত্রে তুমি আমারি শয্যা-সঙ্গিনী হবে। যথাসময়ে হজমী গুলি দিয়ে নিরাময় করব।

এরপর বেরিয়ে পড়তেই হয়।

লতিকার ইচ্ছে ছিল ওর আর শোভনার সঙ্গে আমি ওর ঘরে শুই। জয়া তার আগে আমায় ছোঁ মেরে তার ঘরে এনে খিল এঁটে দিল। বলল—আব্দার আর কি। যে আসবে সেই ওর ঘরে শোবে আর আমি একা-একা মরি।

এবার একটু রঙ্গ করি। এদেরই সঙ্গে থাকতে হবে তো, সহজ হওয়াই ভালো। বলি—তেমন দাবি কে করছে ? বরং সরস হয়ে ডালপালা বিস্তার কর। আমরা হাবাগোবার দল একটু ট্রেনিং পাবার সুযোগ লাভ করে ধন্য হই।

—এই তো, মুখে দিব্যি কথা জোগায় দেখছি, কে বললে ম্যাদামারা। তা না হবেই বা কেন, কার বান্ধবী সেটা তো একবার দেখতে হবে। তারপর সখেদে বলে—আর ভাই আমরা কী ট্রেনিং দেব ? তোমাদের কাছে আমরা তো চলি-চলি-পা-পা।

—তোমাদের কাছে ?

—ঐ তোমার বান্ধবীর কাছে। আর তুমি যখন ওর বান্ধবী তখন তোমার কাছেও। কে জানে তুমি আবার কোন ক্ষণজন্মা। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখ বড় বড় করে ঘোরায়।

—আচ্ছা, বার বার তুমি ঐ বান্ধবী কথাটা ব্যবহার করছ কেন ? রেবাকে—

—থাক থাক, আর বাজে বকো না। এত বান্ধবীত্ব যে রমেশের বাবার কাছে বিয়ের জন্য ঘটকালি করতে গিয়েছিলে মনে পড়ে ? বাধা দিয়ে বলে সে।

—তুমি অনেক কিছুর খোঁজ রাখ দেখছি। কিন্তু বিয়ের ঘটকালি করতে গিয়েছিল ললিতাদি আর শেফালি। যাক্ সে কথা, রেবার সম্বন্ধে তখন কি বলতে চাইছিলে ?

—সে তো তুমিও জান।

—মানে ?

—মানে আবার কী। ওর জীবনের ঘটনা তোমার নিশ্চয় জানা আছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে আর নতুন কী।

—শুনি।

—ওরা দুজনে প্রেমে পড়েছে। রমেশবাবুর জোর করে একটা বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—তারপর ? স্বরে বিদ্রূপ।

—তারপর আবার কী ?

—তারপর কী তুমি সত্যি জান না ?

—না, ব্যাপার কী ? আমি ভয় পাই।

—কিছু না, শুয়ে পড়।

—বাজে কথা রাখ। এই রকম আধখানা কথা শুনে শুয়ে থাকা যায় নাকি ? বিশেষ করে ওদের সম্বন্ধে।

—তোমার দেখছি ওদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। মাথার বালিশটা চাপড়ে নিচু করতে করতে বলে জয়া। —আমারো আছে, তবে রেবার প্রতি নয়। কি একটা মেয়েমানুষ, ছিঃ !

—রেবাকে ছিঃ ! কেন, সে এমন কী করেছে ?

—করেনি কী ? আজ এ ফুলে মধু তো কাল ও ফুলে মধু। আর নিষ্ঠা

না থাক, রুচি থাকাতে আপত্তি কি। একটা পাঁড় মাতালের সঙ্গে—থি শুয়ে পড়। কথার শেষে সত্যি সত্যি সে আমার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়ে।

উঠে বসি এবার। জোর করে তাকে এপাশ ফেরাই। বলি—ন্যাকামি রাখ। কি হয়েছে, কে মাতাল বল।

—কে আবার, ঐ নির্মল রায়, রেডিও আর্টিস্ট। গায় ভালো কিন্তু পাঁড় মাতাল। আর কী চোয়াড়ে দেখতে, একবার চোখ পড়লে আর দুবার দেখতে ইচ্ছে করে না। তারই সঙ্গে......

আমি চুপ হয়ে যাই।

জয়া আড় চোখে একটি কটাক্ষ হেনে বলে স্কুল-কলেজে তো শ্রীমতীর সুনামের অন্ত ছিল না।

—কে বললে? আমি রুখে উঠি।

—থাক থাক, আজ বারো বছর মাস্টারি করছি। ছেলেমেয়ের মুখ দেখলেই বুঝতে পারি বিদ্যের দৌড় কতদূর।

একে আর কী বোঝাব। বলুক ও কি বলতে চায়। দেখি ওর ঐ পাতের মতো দেহটায় কত বিষ জমা আছে।

হ্যাঁ যা বলছিলুম। জয়া শুরু করে—ঐ রমেশবাবুর সঙ্গে তারপর কি হৈ-হল্লা। রোজ বিকেলে গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার, ছবি আঁকা, চা খাওয়া-খাওয়ি, তারপর হাত-ধরাধরি করে বেড়ানো। বলি এখানে পড়াতে এসেছিল না রূপ দেখাতে এসেছিল। দিব্যি তো দিল্লীতে মাস্টারি করছিলি। কিন্তু এ রকম করলে কে রাখবে। এখানেও তাই। নোংরা ঘাঁটা যার স্বভাব সে স্থির হয়ে থাকবে কী করে। এখন আবার কোথাও নতুন ফুলের মধু পান করছে বোধহয়। তা বাহাদুরি আছে তোমার বান্ধবীর। কারুর সারা জীবনে একটা জোটে না আর ওর ঝাঁকে ঝাঁকে।

অজ্ঞাতে নিজের মনের কথাটি বলে জয়া আবার পাশ ফিরল।

আমি ভাবি একী হল। জয়ার কথার ডালপালা বাদ দিলেও কিছু সত্যি নিশ্চয় আছে। কিন্তু রেবার চরিত্রে তেমন স্বভাবের ছাপ কোথায়?

চোখ বুজে ওর মূর্তিটি সামনে ধরি। দুপাশ বেয়ে কুঁচ চুলগুলি টানা। ভুরুর ওপরে, শান্ত চোখের পাতায়, চাপা ঠোঁটের খাঁজে খেলা

করছে। একহারা চেহারা শ্রী ও হ্রীকে ধরে আছে। ওর মধ্যে কোথায় সে দুর্বলতা, কোথায় সে নোংরামি। তবে?

জয়া দেখি আবার সোজা হয়ে শোয়। বলে—আর তোমার গিয়ে ঐ রমেশবাবুটিই বা কী। পুরুষমানুষের কি হ্যাংলামি। বুড়ো বাপ এসে কী টানাটানি। তা কিছুতে রেবার সঙ্গ ছেড়ে গেল না।

আমি যেন অকূলে কূল পাই—রমেশবাবুর বাবা এসেছিলেন?

—এখানে কেন, দিল্লীতে। রেবা তখন দিল্লীতে ছিল, সঙ্গেসঙ্গে রমেশ। পুরুষমানুষের সতীত্বের বালাই না থাক সম্ভ্রমের বালাই তো আছে। কাজেই বাপ না এসে কী করে। কেমন ঘরের ছেলে! কিন্তু—যাক আমি কেন আর বকে মরি। কাল শোভনাকে জিজ্ঞেস কর। দিল্লীর খবর তো ঐ দিল। কারুর নামে অযথা কিছু বানিয়ে বলা আমার স্বভাব নয়।

সে আমি বুঝি। রেবার কাহিনীর ওপর ও যে কালি ছেটাল ওকাজও করত না যদি জীবনকে সহজ করে পেত। কোথায় নিজের সংসারে বসে সিঁথেয় সিঁদুর টেনে ছেলেমেয়ে-স্বামীর মাঝে পলকে নিজেকে হারাবে আর পলকে খুঁজে পাবে। তা নয়, চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে নিত্য আনন্দহীন কর্তব্যের জোয়াল ঠেলে চলা।

কিন্তু আর না। শোভনাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আর এক দফা হলাহলের সম্মুখীন হবার দরকার নেই। আসল ব্যাপার তো বুঝে নিলুম। রেবা মধুবিলাসিনী নয়। তবে এই ভাঙনের গলদ কোথায় তা আবিষ্কার করতে হবে।

বাইরে গরম হওয়া মাতামাতি করছে। তার রেশ ঘরে ঢুকে চোখে জালা ধরিয়ে দিল।

॥ পাঁচ ॥

ছুটি ছুটি ছুটি।

এই দীর্ঘ সময়টিতে কত কী হয়ে গেল। আকাশে কত রঙ ধরল; সুবাস বিলিয়ে ফুলে ফুলে কত কথা হল, মাটির ওপর কত আনন্দের উৎস জেগে বেদনার মরুবালিতে লীন হয়ে গেল। তারপর একটি করে সতেজ পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে জানিয়ে দিল একটি বছর শেষ হয়ে গেল।

এখানে প্রকৃতির এখন ভৈরব মূর্তি। মোগলসরাইয়ে দেখব তারভ্রূকুটি। কোলকাতায় যে কদিন পরে শিশু ভোলানাথ হয়ে কাঁদবে।

এক বছর পরে বাড়ি চলেছি। পুজোর সময় অসুখ করেছিল, তাই যাওয়া হয়নি। শীতের ছুটি আর কদিন। এবার গরমের লম্বা ছুটি মুক্তি এনে দিল। বাবা, কী একঘেয়ে জীবন! সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যেন একই নাটকের রিহারসাল চলে। সেই এক ভাবনা, একই কথার পুনরাবৃত্তি আর এক রকম কাজ।

গাড়ি পৌঁছবার আগেই মন বাড়ি পৌঁছে যায়। ছাদের কোণে মার হাতের ফুলের গাছগুলির পাশে মন ঘোরাঘুরি করে। বেল-জুঁই এখন বোধহয় গন্ধ ছড়াচ্ছে। রজনীগন্ধার পরিচর্যা এবার আমি গিয়ে করব, তবে সে বর্ষায় গন্ধ দেবে। এদের সঙ্গে মাকে পাব না ভাবতে চোখ জলে ভরে ওঠে।

স্টেশন বেরিয়ে যায়—ফতেপুর, এলাহাবাদ, মীর্জাপুর, মোগলসরাই—হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হয়ে যায়—হৈ হৈ, হুড়মুড়, হুড়দাড়। আত্মস্থ হতে দেখি ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি বিরাট সংসারের মাঝে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। পাশে বসে মেজদির ননদ হিরণদি।

তাঁর চেহারা গোলগাল। ডাগর দুটি চোখ স্নেহে সিক্ত; ঠোঁটের ডগায় মায়া-মাখানো হাসি। এলো খোঁপা থলথলে হয়ে ঘাড়ের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। কপালে ডবডবে সিঁদুরের টিপ। সাদা সেমিজের ওপর ভাঁজভাঙা চওড়া-পাড় শাড়ি। হিরণদির এক নিখুঁত ছবি।

যতবার দেখেছি ততবারই এই এক বেশবাস। অনুযোগ করলে মিষ্টি হেসে উত্তর দেন—কখন করব বল তো ভাই।

গাড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখি ছোট, বড়, সাদা, কালো, কিন্তু সব কটি গোলগাল প্রায় দেড় ডজন ছেলেমেয়ে প্রায় ততগুলি পুঁটলি প্যাটরার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। এরা হল হিরণদির রাবণের গুষ্টি—মানে হিরণদির বিপুল আগ্রহে সংগ্রহ করা মা-বাপ-মরা পুষ্যির দল।

নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের জগন্মাতা দেবী উমা বছরে চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসেন। কিন্তু বাঙালী মায়েদের হৃদয় ভেঙে গড়া মেয়েদের অনেকে সামান্য কারণে বা অকারণে বিয়ের পর

বহু বছরে বা সারা জীবনেও একবার বাপের বাড়ি আসতে পায় না। হিরণদির মেয়ের অবস্থা তাই।

প্রথমে মেয়েকে আনার অনেক চেষ্টা করলেন। পরে নিরাশ হয়ে অনাথ আশ্রম খুলে বসলেন। আত্মীয়স্বজন কারুর অসুখ করলেই হিরণদির শ্যেন দৃষ্টি সেখানে গিয়ে পড়ে। তারপর রোগী বা রোগিণীর মৃত্যু হলে মামুলি কান্নাকাটির পর ছেলেমেয়ে যাকে পান এক ঝটকায় নিজের ঘরে তোলেন। প্রতিবাদ করতে গেলে তিনি এমন যুক্তি দেখাবেন যে শেষ পর্যন্ত রায় তাঁর পক্ষে যাবেই।

সে বছর বি. এস. সি. ফাইনাল দিয়ে মেজদির সঙ্গে ওঁদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। সে সময়ে ঐ ষষ্ঠীর মা মারা গেল। দেখলুম কেমন দক্ষতায় হিরণদি তখন ব্যাঙাচির মতো ষষ্ঠীকে তাঁর পরিবারভুক্ত করলেন। তারপর হিরণদির কথায় রুপো, পেতল, লোহার বালা, তাগা ও একমুঠো মাদুলির দৌলতে তিনিই তো ঐ ছেলেটাকে যমকে কলা ঠেকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এরপর ও ছেলে হিরণদির হবে না তো কার হবে।

সেই সব যমে-ঠেকানো ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দক্ষযজ্ঞ শুরু করল। আর হিরণদি বেঞ্চের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কারুর চুল আঁচড়ে দিতে, কারুর দুধ তৈরি করতে, কাউকে খাবার খাওয়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বকুনি ও গায়ে হাত বুলিয়ে আদর চলতে লাগল। পুঁষ্যির দল দুইই মিটিমিটি চোখে উপভোগ করতে লাগল।

এক সময়ে দেখি আমিও ওঁর পুষ্যিভুক্ত হয়ে গেছি। গায়ে হাত বুলিয়ে শুরু করলেন—কত রোগা হয়ে গেছিস (এটা ওঁর মুখের বুলি। উনি সবাইকে রোগা দেখেন)! আহা, তা আর হবে না, ঘুরে ঘুরে চাকরিবাকরি করলে আর শরীর থাকে। ও সব হল গিয়ে ব্যাটা ছেলের কাজ। ওদের শক্ত শরীর—ঐ গো দেখ দেখ, তাঁর স্বামী অবনীমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলেন—ঢুলতে ঢুলতে ছেলেটা বুঝি পড়েই মলো।

বলা বাহুল্য, নিরীহ অবনীমোহনবাবুও তাঁর পুষ্যিগোষ্ঠীর একজন। এ বিষয়ে হিরণদিকে টুকলে বলেন—আহা, ওদের মতো অসহায় পরমুখাপেক্ষী আর আছে। সামান্য ওষুধটুকুও ঢেলে খাবার ওদের ক্ষমতা নেই। সব সময়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তাই তো ভগবানকে বলি, ঠাকুর

আগে যেন ওঁর মৃত্যু হয়। আমার অবর্তমানে কত কষ্টই হবে। স্বামীর সেই ভবিষ্যৎ কষ্ট কল্পনা করে পতিব্রতার চোখ টলটল করে ওঠে। যার জন্ম এত ভাবনা তিনি নির্বিকার চিত্তে রহস্য সিরিজের পাতা উলটে চলেছেন।

মুখের কথায় কাজ হয় না দেখে ঝুঁকে স্বামীকে ঠ্যালা দিয়ে বললেন—ওগো শুনছ, ছেলেটা—

অবনীমোহনবাবু চমকে জিজ্ঞাসা করেন—আমায় কিছু বলছ?

এবার হিরণদি মুখিয়ে ওঠেন—না, দেয়ালকে। কী আনাড়ি নিয়ে ঘর আমার···শেষে নানা আক্ষেপ করতে করতে নিজে উঠে ছেলেটাকে ঠিক করে শুইয়ে দেন। তারপর কাছ ঘেঁষে বসে ছেড়ে-যাওয়া কথার খেই ধরেন—তাই তো বলি মেয়েমাহুষের দরকার কি বাপু চাকরি করার, কিন্তু কে শোনে। এই দেখ না আমাদের রেবা। চাকরি করতে গিয়ে কী চেহারা হয়েছে।

—রেবা, কোন রেবা?

—ঐ যে রেবা মজুমদার তোমাদের কলেজে পড়ত।

জয়ার সঙ্গে আলোচনা হবার পর রেবার সম্বন্ধে স-ঠিক খবর জানবার চেষ্টা করে নিরাশ হয়েছি। শেফালিদের কারুর ঠিকানা জানা ছিল না। অগত্যা বৌদিকে একটা চিঠি দিয়েছিলুম। তার উত্তর জয়ার মন্তব্যের চেয়ে সুরুচিপূর্ণ নয়। তারপর আশা ছেড়ে দিলুম।

হিরণদি বলে চলেন—ও তো আমার মামাতো ননদ। এই তো ওর বিয়ে গেল। ওখান থেকেই ফিরছি।

—রেবার বিয়ে!

—হ্যাঁ ভাই, তা সে নামেই বিয়ে। তোমাদের কলেজে যখন পড়ত তখন তোমরা সব জান নিশ্চয়। আহা কি থেকে যে কি হয়ে গেল। হিরণদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

আমি অবাক।

কোলের পুষ্যিটিকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আবার বলেন—কী সুন্দর মেয়ে, যেমন রূপে তেমনি গুণে। রমেশের সঙ্গে কেমন মানাত, সেও তো তেমনি। কিন্তু বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা উঠল।

বাঁদরের গলায়! কার সঙ্গে বিয়ে হল শেষ পর্যন্ত? আমি আর থাকতে পারি না, প্রশ্ন করি।

—ঐ যে নির্মল রায়, রেডিও আর্টিস্ট, ওর সঙ্গে। এ বিয়েতে তো রেবার একেবারে ইচ্ছে ছিল না। একরকম নিরুপায় হয়েই এ কাজ করল।

—কী হয়েছে হিরণদি?

—সে ভাই অনেক কথা। রমেশকে তার বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বাড়ি যেত না। যেখানে রেবা সেইখানেই সে থাকত। ছেলেকে যখন বুঝিয়ে পারলেন না তখন রেবাকে ধরলেন—তুমি সরে দাঁড়াও, ও যে আমার ছেলে, বাড়ি ফিরবে।

রেবা দিল্লীতে কাজ নিয়ে চলে গেল। রমেশ খোঁজখবর নিয়ে সেখানে হাজির। রেবা কানপুরে গেল। সেখানেও রমেশ তাকে অনুসরণ করল। হ্যারে, চারহাত এক করে বিয়েই না হয় দেওয়া হয়নি, কিন্তু মনে মনে তারা তো একে অপরকে জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী বলে মেনে নিয়েছে। ছাড় বললেই কি ছাড়াছাড়ি হয়, ভেতরের টান যাবে কোথায়। আর পুরুষ জাতটাই হল গিয়ে অক্ষম, মেয়েদের আঁচল ধরে ধরে ওরা শিশু থেকে বুড়ো হয়। আত্মনির্ভরতার বালাই ওদের নেই। এই দেখ না সেবার আমায় বিছে কামড়াল তো ঐ পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়ো হাউ হাউ করে কেঁদে অস্থির। তারপর আমাকেই গোঙাতে গোঙাতে বলতে হল, ওগো, আমি মরিনি, মরব না, ঠিক বেঁচে উঠব। তবে শান্ত হয়। রমেশেরও তো সেই অবস্থা গো। হুম করে বিয়েটা না দিয়ে একটু ভেবেচিন্তে কাজ করলে তোমার এত দুর্ভোগ হত না।

—যাক গে, তারপর?

—তারপর বাপ তো ছেলের কাণ্ড দেখে চুপ হয়ে গেলেন। ওরা দুটিতে আবার তেমনি হেসেখেলে দিন কাটাতে লাগল।

কানপুরে থাকতে রেবা রেডিওতে গান গাইত। সেই সময়ে এই নির্মল রায়ের নজরে পড়ে। নজরে পড়বার মতো মেয়েও তো। কিন্তু নির্মলের গুণ জানতে রেবার দেরি হয় নি। তাই আমল দিত না, পাশ কাটাত। হলে কি হবে, রত্ন যে ওর বরাতে নাচছে।

কালবোশেখী ঝড় উঠেছে। গাছপালা অবিরাম সেই নিষ্ঠুরের পায়ে মাথা

খুঁড়ছে। গাড়ি গর্জন করতে করতে ছুলছে। চোখে মুখে বালি
আমরা অস্থির। হিরণদির অনুরোধে জানালাগুলো ফেলে দিয়ে এসে ব
বলি—বিয়ে করল বলেই না রত্ন লাভ হল। রেবা বিয়ে করতে গেল
অমন লোককে? ওর সম্বন্ধে আমিও যা-তা শুনেছি।

—এই দেখ, ইচ্ছে করে করল নাকি। শোন সব আগে। আহা, ব
বুক ফেটে যায়। যখন ওরা ছুটিতে ওদের স্বপ্নে বিভোর, রেবার কাছে
বে-নামী চিঠি এলো—গঙ্গার ধারে দেখা কর। গিয়ে দেখে রমেশের
রেবার হাতে একটা থলি ধরিয়ে দিয়ে বলল—এতে আমার যথাসর্বস্ব আ
নাও। আর গঙ্গাজলে শপথ করে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যা
নয় তো আমি তোমার সামনে ডুবে মরব।

—কী বলছেন আপনি হিরণদি! আমি তাঁর দুহাত জড়িয়ে ধরি।

—সেই হতভাগিনীই চোখের জলে তার বুকের বোঝা আমার কা
নামিয়েছে ভাই। তোমার মতো আমিও শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলু
যাক গে, তাড়াতাড়ি শেষ করি। এই ঘটনার পর রেবা কাণ্ডজ্ঞান হারি
ছুটতে ছুটতে একেবারে নির্মলের বাড়ি। সেখানে বিয়ের পাকাপাকি ব্যব
করে তারপর সর্বনাশী ঘরে এলো। হিরণদির চোখ জলে টৈটুম্বুর। এ
সামলে বললেন—বিয়ের সময় মেয়ের মুখ যেন নতুন চুনের মতো সাদা, চো
রাখা যায় না।

গরমে দম আটকে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে ঝপঝপ করে
কটা জানালা খুলে দিই। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি ঝড় থেমে গিয়ে পৃথি
এখন নিথর হয়ে যাচ্ছে। আমিও জমাট বেঁধে গেছি।

পুষ্যির দল ঘুমিয়ে পড়েছিল। হিরণদি সবাইকে টেনে টেনে তু
খাওয়ালেন। অবনীমোহনবাবুও শিশুদলভুক্ত। না, হ্যাঁ আমতা আম
করে স্ত্রীর সোহাগের শাসনের আড়ালে বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলেন
আমিও বাদ পড়লুম না।

সব সেরে অনেক রাত্রে হিরণদি নিজে খেয়ে জায়গার অভাবে বসে ব
ঢুলতে লাগলেন। আমার চোখে আজ ও-সবের বালাই নেই। এক
বেদনা মৌনমূর্তি ধরে মনের দোরে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে যেন প্রশ্নের
নেই।

টাকার থলি নিয়ে যে আসে তাকে বোঝানো মুশকিল যে হৃদয়াবেগ আর ও জিনিস এক নয়। কিন্তু তার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে দিতে রেবা একি করল! সত্যিই কি সে রমেশকে এড়িয়ে থাকতে পারবে? তার আত্মবলিদান রমেশকে ঐ ভিখারিনীর ঘরে বন্দী করে রাখতে পারবে তো। ভাবনা সব এলো-মেলো হয়ে যায়, মাথাটা মনে হয় যেন বড্ড বেশি ভারী।

॥ ছয় ॥

পচা ভাদ্রে সর্বত্র জলে জলে যেন জলময়। তারপর আশ্বিন। এবারে আশ্বিনও যেন পচা। ঐ তো, কী মেঘ করেছে। কালো কালো জলভরা মেঘের ভারে আকাশ যেন মাটিতে ঝুলে পড়েছে। মনে হয় তার কোথাও একটা ফুটো করে দিলে তা থেকে একসঙ্গে এত জল পড়বে যে একটা নদী তৈরী হয়ে যাবে সেখানে।

ঐ যে জলে-ভেজা পথ বাড়িঘরের আড়াল দিয়ে বেঁকে কোথায় যেন চলে গেছে অমন জায়গা কেন জানি না আমি সহ্য করতে পারি না। পথের বাঁক, নদীর বাঁক, মনের বাঁক দেখলেই আমার মনটা হু-হু করে ওঠে। মনে হয় ওরা যেন সর্বনাশা, যেন কার হৃদয়ের কি ধন আছে তাই ছিনিয়ে নেবার জন্য ওত পেতে বসে আছে তাই অমন বাঁক দেখলেই বুকের ভেতর থেকে গেল গেল, সব গেল, সামাল সামাল রব শুনতে পাই। আজও সকাল থেকে মেঘের আঁধারে ছায়াচ্ছন্ন ঐ পথের বাঁকের দিকে চেয়ে ভেতর থেকে সেই রব শুনতে পাচ্ছি।

রোজই জানালা দিয়ে দেখি ঠিক দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার আগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে সামনে ঐ বালুচরায় খেলা করে। তাদের খেলা হল বালির মধ্যে পা ঢুকিয়ে গোল গোল খেলাঘর তৈরী করা। তারা পেছন ফিরলে ঘরগুলি ভেঙে পড়ে। তারপর বৃষ্টির জলে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কী করুণ রাগিণীতে সানাই বাজছে। বিসর্জনের বাজনা বিসর্জনের মতোই করুণ। এত আশা, আনন্দ হাসি গান সব যেন কটা দিনের মধ্যে বুদ্বুদের মতো পলকে মিশিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি ঐ সুর যেন তাদের চলে-যাওয়া পায়ের বিদায়ের করুণ মূর্ছনা।

রমেশবাবুর বিদায়কালের পায়ের আওয়াজে কি এই সুর ছিল।

ষোড়শী সবিতার কথা মনে গুন্ গুনিয়ে ওঠে। সেদিন যদি অমন করে ও উমানাথের মন্দির থেকে আসতে গিয়ে পড়ে না যেত তবে আরো কতদিন রমেশবাবু সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকতে হত কে জানে।

অদ্ভুত মেয়ে সবিতা—যেন একটা চলন্ত ট্রেন। না হাত-পা, না মুখ কিছুরই বিরাম নেই। ছটফটে ভাব আর খিলখিল হাসি যেন লেগেই আছে।

সেদিন কী জোরে পড়ে গেল। অন্য কেউ হলে প্রথমে অপ্রস্তুত হত, তারপর ব্যথার চোটে অন্ধকার দেখত। কিন্তু সবিতার পড়ে গিয়ে কী হাসি। হাসতে হাসতে সে আর উঠতে পারে না। উঠতে গিয়ে বরং আরো দুধাপ নিচে গড়িয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে হাসির বেগ বাড়ে—খিল খিল খিল। সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

আমিই টেনে তুলে ধরি। উঠিয়ে দাঁড় করাতে গেলে আমার গায়ে হেসে ঢলে পড়ে। তার জায়গায় আমিই অপ্রস্তুত বোধ করি আর বোধ করেন তার সঙ্গের মানুষটি।

সবিতা পড়ে গিয়ে হাসে আর তার কত লেগেছে ভেবে ঐ মানুষটির মুখ ব্যথিয়ে ওঠে। তাইতেই তো সম্পর্কটা বুঝতে পারি।

তাকে তুলে ধরে জোর করে বসালে এগিয়ে এসে খোঁজ করেন—কোথাও লাগল নাকি?

—লাগল। হা হা হা হি হি হি হো হো হো।

আমি যা জানতে চাইলুম তার উত্তর নেই, কেবল হা হা হা, অনুযোগ সঙ্গের মানুষটি।—অযথা হাসি মানে 'এনার্জি' ক্ষয় করা।

—কী কী বললে? হা হা হা হি হি হি। জান আমার এত এনার্জি আছে যে ধরে রাখতে পাচ্ছি না, মিনিটে মিনিটে ক্ষয় করলেও ফুরবে না, চেষ্টা করলেও শেষ হবে না। তাই—হা হা হা হি হি হি……

—আচ্ছা আচ্ছা, খুব হয়েছে, এবার থাম।

হাসিখুশি আনন্দ উচ্ছল একটি আত্মহারা মেয়ে। সময়ে মনের মতো শ্বশুরবাড়ি ও স্বামী পেলে মেয়েরা অমনিই হয়। তার ওপর স্বামীর সত্যিকারের ভালবাসা পেলে তো কথাই নেই, তখন তাদের মধ্যে তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাস, ফুলের আত্মত্যাগ ও ঋষির ক্ষমাশীলতার রূপ ফুটে ওঠে।

আমিও বলি—থাম। কিন্তু সবিতা সে মেয়েই নয়। গায়ে পড়ে ভাব

করে। তার বাড়িতে টেনে টেনে নিয়ে যায়। দুনিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, যা জিজ্ঞাসা করা করা উচিত নয় তাও করে। বিব্রত হয়ে পালিয়ে আসি কিন্তু আবার ধরা পড়ি। এক-এক সময়ে কপট নিন্দে করি—কী বেহায়া বৌ বাবা! কে বলবে দুমাস মাত্র বিয়ে হয়েছে, যেন—কিন্তু এরপর আর আমি এগুতে পারি না। তার স-শব্দ হাসির চোটে আমায় থামতে হয়।

একদিন দেখি লুচির জন্য মাখা ময়দা নিয়ে চটকাচ্ছে।

ব্যাপার কী? প্রশ্ন করি। এবার কী ধিঙ্গিপনা ছেড়ে খুকিগিরি চলবে? অমলেশবাবু কোথায়?

—গৌহাটির ভাত বাড়ন্ত তাই বার্থ রিজার্ভ করতে গেছেন।

—আর তুমি মানুষকে উত্ত্যক্ত করবার সুযোগ হারিয়ে ময়দার ওপর ঝাল ঝাড়ছ।

—মোটেই না, তোমার জন্য একটা বর গড়ছি। কতকাল আর আইবুড়ো সরস্বতী হয়ে থাকবে।

—থাক, ও ময়দার ড্যালায় আমার প্রয়োজন নেই।

—তাই বল। তবে যে সেদিন বললে এখনও হোঁচট খাওনি। না বাবা, তাহলে জামাইবাবু গড়ে কাজ নেই। শেষকালে রমুদার মতো প্রেম আর বিয়ের মাঝখানে পড়ে নিরুদ্দেশ হতে হবে।

—রমুদা...প্রেম আর বিয়ে……নিরুদ্দেশ! এসব কথার মানে?

—সে আমার এক মাসতুত ভায়ের জমজমাট কাহিনী। তবে শেষের দিকে সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল।

আন্দাজ ঐ করি রমেশবাবুর কাহিনী। কৌতূহল দমন করতে পারি না। না জানার ভান করে প্রশ্ন করি—কী ব্যাপার? শেষের দিকে কী হল?

—রমুদার বাবা—মানে আমায় মেসোমশাই যাকে বলে একেবারে মধ্যযুগীয় 'বিউরোক্র্যাট্'। নিজের পছন্দমত মেয়ে শেতলা বৌদির সঙ্গে রমুদার জোর করে বিয়ে দিলেন। বৌদি অবশ্য আহামরি নয় তবে ছি-ছিও নয়। তোমার আমার মতো স্কুল-কলেজে পড়েনি বটে তবে চিঠিলেখার মতো বিদ্যে আছে। দেখতে গোলগাল, ড্যাবা চোখ। ঠোঁট

দুটো। অবশ্য মোটা, তা আমাদের দেশে ডানাকাটা পরী আর কটা।

কিন্তু রমুদার মন বিয়ের আগেই অন্যত্র বাঁধা। তোমার ঐ অমলেশ-বাবুর বেহালার তার বাঁধার মতো নয়, যার স্বর দিনের মধ্যে পাঁচবার নেমে যায়। সে বন্ধন যাকে বলে একেবারে—

—রাখ দিকি তোমার বাক্যবিন্যাস, আসল ব্যাপার বল।

—কী জ্বালা! তুমি তো দেখছি সেই 'ফুলুল আর মলোর' দলের। যাক্ শোন। রমুদা মেসোমশায়ের চাপে পড়ে বিয়ে করল বটে, কিন্তু তার-পরেই জেহাদ ঘোষণা করল—মানে বাড়ি ছেড়ে যত্র রেবা তত্র সে বাস করতে লাগল।

—রেবাকে তুমি দেখেছ ?

—শুধু দেখেছি নয় তারও বেশি—মানে ভাল রকম জানি। আরে মেসোমশায়ও জানতেন, অবশ্য আমাদের মতো নয়। কিন্তু মতিভ্রম। নিজের জেদ বজায় রাখার মোহে ভাবলেন বোধহয় বিয়ে নামক এক ডোজ ওষুধ দিয়ে দিই তাহলেই পুত্রের প্রেম নামক ব্যাধিটা কুইনাইন ইনজেকশান্ দেবার পর ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো তরতর করে ছেড়ে যাবে। কিন্তু মনের মানুষকে ছাড়া কি অত সোজা, তুমিই বল না।

—বলব আর কি। তোমাদের চোখের সামনে দেখেই সে তত্ত্ব বুঝতে পারছি। তারপর ?

সে প্রথমেই লাল হয়ে যায়। তারপর মুখ খুলে সবচেয়ে বড় মিথ্যে কথাটা বলে—মোটেই না। আমি ওকে একবার কেন দশবার ত্যাগ করতে পারি। ভারী তো—

বাধা দিয়ে বলি—থাক্ থাক্ অযথা শক্তির অপব্যয় কর না। মেয়েদের বীরত্ব দেখাবার আহ্বান এখন নানা দিক থেকে আসছে। তুমি তোমার ভায়ের কথাই বল। রেবার সঙ্গ নিল, শেষে—?

—ঠিক তার শেষে কি হল জানি না। তবে এটুকু জানি রেবা নাকি মনের দুঃখে বাধ্য হয়ে এক মাতালকে বিয়ে করেছে। আমার মনে হয় এ ঐ মেসোমশায়ের কলকাঠির কেরামতি। ফল পেলেন হাতে হাতে, রমুদা নিরুদ্দেশ হল।

—সত্যি নিরুদ্দেশ ?

—সত্যি নয় তো কি মিথ্যে। মেসোমশাই চারধারে খবর পাঠালেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে কেউ বলল্ পুরীর মন্দিরে সন্ন্যাসী বেশে রমুদাকে গাঁজা খেতে দেখেছি। কেউ বললে মাদ্রাজে মেয়েদের সঙ্গে হৈ-হল্লোড় করে সমুদ্রস্নান করতে দেখেছি। কেউ বলল যে বোম্বেতে সিনেমায় ঢুকেছে। করাচীতে মুসলমান রূপে কেউ দেখল। দিল্লীতে রেসের মাঠে, লক্ষ্ণৌএ নাচওয়ালীর সঙ্গে, কাশীর নোংরা গলিতে অমনি সব জায়গায় সবাই তাকে দেখতে লাগল। বাপের অবাধ্য, বৌয়ের প্রতি অবিবেচক লোক অমন জায়গা ছাড়া আর কোথায় যাবে এই ভাব আর কি।

বৌদির জন্য আমার সত্যি দুঃখ হয়। এই বয়সে বিধবা দিদিমার কাছে তীর্থে পড়ে আছে। কি দরকার ছিল সব জেনে শুনে জোর করে ওকে রমুদার ঘাড়ে চাপাবার। মেসোমশাই একগুঁয়েমির বশে কি সর্বনাশ যে করলেন। তাঁর নিজেরই কি কম শাস্তি। হা ছেলে জো ছেলে করে জীবন বার করছেন। রাস্তায় ঘুরে বেড়ান আর ফর্সা ছিপছিপে কেউ নজরে পড়লেই দৌড়ে কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন রমুদা না আর কেউ। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কোনদিন হয়তো শুনব একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন।

বাইরে বর্ষার ঘরের মধ্যেও থম্‌থম করে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে।

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে খোঁজ করি—সত্যি তোমার ভায়ের কোন ঠিকানা পাওয়া যায় নি ? সে রকম চেষ্টা করা হয়েছে কি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ করা হয়েছে বৈকি। মেসোমশাই নিজেই করেছেন। আমার মা, বাবা, তিন মামা এঁরা যথেষ্ট খোঁজখবর করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছেন।

কালো মেঘ চুঁয়ে চুঁয়ে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। এখুনি হয়তো ঝমাঝম্ করে নামবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি নিজের ডেরার উদ্দেশ্যে। বিদায়-সম্ভাষণ আর জানানো হয় না। গলার কাছে মনে হয় যেন এক ড্যালা শুকনো ভাত আটকে গেছে।

এখানে ওখানে চাকরি করে ঠিক পাঁচ বছর পর কোলকাতায় এলুম।

শীতের দুপুর যেন প্রাচীনের ঘোলাটে ঠাণ্ডামারা চোখ। আছে কিন্তু তার তাপ নেই; হাওয়ায় পুলক-শিহরণ নেই, অক্ষমের কাঁপুনি। কুয়াশার ধাঁধা ভেদ করে সব কিছু অস্পষ্ট সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমস্ত সময়টা যেন বাসি মুড়ির মতো থেকে মনে বিষাদ-ভাব জাগায়। তাই বাড়ির রান্না পেয়ে খাওয়া সত্ত্বেও ম্যাটিনি শো দেখতে বেরুলুম।

ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে রমেশবাবুদের বাড়ির সামনে থমকে গেলুম। বিরাট বাগান এখন জঙ্গল। নানা রঙের জংলী যেন কুতূহলী শিশুদের মতো সবুজ পাতার বাধা ডিঙিয়ে উঁকি মারছে।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে শুয়ে বসে খেলা করে সময় কাটাচ্ছে। তাদের হাসি হাওয়ায় বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করছে।

মাঝখানে শ্যাওলা-ধরা ফাটলে ফাটলে বট-অশথের চারা নিয়ে করে দাঁড়িয়ে আছে এককালের মস্ত শৌখীন বাড়িটি। অনেকক্ষণ মনে হয় ও যেন একটি অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথাভরা মৌন উত্তর।

॥ সমাপ্ত ॥

॥ আলোচনা ॥

জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে

'পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু—

শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচয়ে' জীবনানন্দ দাশের কবিপ্রতিভাসম্বন্ধীয় আলোচনাটি প্রচেষ্টা হিসেবে অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু সযত্নে আসল বিষয়টি পরিহার করবার বিপজ্জনক উদাহরণ হিসেবে আপত্তিকর। সাধারণ সমালোচকবর্গের মতো মণীন্দ্রবাবু জীবনানন্দকে 'নির্জনতম' কবি বলে সরিয়ে রাখেন নি এটা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্মরণীয় যে সমস্যার মূল সন্ধানে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। এর কারণ তাঁর আলোচনার মধ্যেই নিহিত আছে।

মণীন্দ্রবাবুর সমস্ত আলোচনাটির স্থির বিশ্লেষণে জ্ঞাতব্য যে জীবনানন্দ-মানসের মূল সন্ধানে তিনি তাঁর ব্যক্তিমানসের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে কবির প্রথমজীবনের কাব্যরচনায় দ্বিধাগ্রস্ততার কারণ তাঁর নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমনের স্বপ্নরতি। এ মতবাদ আপত্তিকর। যে কোন ব্যক্তিমানস তার পারিপার্শ্বিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন মাত্র। এবং যে কোন মহৎ শিল্পীর রচনায় স্বীয় আবেষ্টনীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতিক্রিয়া থাকবেই। টলস্টয়ের সাহিত্যবিচারে লেনিনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—If the artist we are discussing is really a great artist, he must have reflected at least some of the important aspects of the revolution in his works (Articles on Tolstoy).

সুতরাং, জীবনানন্দের প্রথমার্ধের কবিতা সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার আগে তৎকালীন পারিপার্শ্বিকের নিখুঁত বিশ্লেষণ কর্তব্য। বিশ-ত্রিশ দশকের বাঙলাদেশের ক্রমভঙ্গুর সামাজিক অবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য এবং বেকারির প্রাচুর্যের প্রতিক্রিয়ায় আপাতদৃষ্টিতে কবি-মানসে হতাশা এবং পলায়নবাদের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। আর রাজনৈতিক অনগ্রসরতা এবং সামাজিক পশ্চাদমুখীনতায় অপরিণত ও অনগ্রসর কবিমানস সমস্যার মূল সন্ধানে প্রায়ই অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে। ফলে, আপন হৃদয়-উত্থিত প্রচণ্ড আক্রোশ স্থির লক্ষ্যের অভাবে প্রচণ্ড বিক্রমে স্রষ্টাকেই আঘাত করে।

এই অবস্থায় সংবেদনশীল কবি-মানস আঘাতের প্রচণ্ডতায় আতঙ্কে পশ্চাদগামী হয়। এমনি অবস্থায় মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে

'শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন,'

অথবা

'আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বেদনায় আক্রোশে ভরে গিয়েছে।'

সেই আবেষ্টনীতে এই আকুল আর্তনাদ করা ছাড়া জীবনানন্দের পক্ষে আর কিছু সম্ভব ছিল না। এই মতের সমর্থনে লেনিনের উক্তি, "But the contradiction in Tolstoy's views and doctrines are not fortuitous, they express the contradictory conditions of Russian life in the last third of the nineteenth century (Articles on Tolstoy) মণীন্দ্রবাবু নিজেও একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে আপন সমস্যা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সমস্যার অন্তর্গত। তাঁর আলোচনার প্রথমার্ধে তিনি এ প্রসঙ্গের কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন কিন্তু তারপরই ইচ্ছাকৃত তথ্যগোপনের অপরাধে তিনি নিশ্চিতরূপে অভিযুক্ত।

আসলে, এ ধরনের আলোচনার মূল ত্রুটি বোধহয় আরও গভীরে। বিচারের মাধ্যমে তত্ত্বে উপনীত না হয়ে নির্দিষ্ট তত্ত্ব সামনে রেখে বিচার করলে দ্বিধাগ্রস্ততার হাত এড়াবার উপায় নেই। বিশুদ্ধ তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে সমাজ-জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের নিত্য চলমান সংঘর্ষকে অস্বীকার করা হয়। আর একথা তো সর্বজনস্বীকৃত যে ইণ্টারপ্রিটেশন চিরকালই সম্পূর্ণ গটা প্রোগ্রামের সমালোচনায় এঙ্গেলস্‌ও এই 'লাসালী' ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন—'the real weakness in the childish notion of the coming revolution which is supposed to begin by the whole world dividing itself into armies; we here, the 'one reactionary mass' there."

মনে হয় মণীন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনার বহুপূর্বেই মনে মনে জীবনানন্দকে সেই one reactioany mass এর দলে কল্পনা করেছেন, নইলে জীবনানন্দের শেষজীবনের কবিতা আলোচনায়ও তাঁর অসাফল্যের কারণ কি? যদিও এ কথা তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে জীবনানন্দের শেষার্ধের কবিতা কিছু পরিমাণে প্রগতিশীল, তবুও তার সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে যে এটা বোধহয় জীবনানন্দের একটা ফ্যাশান মাত্র, যেহেতু তখন বাংলার আধুনিক

কবিদের মধ্যে সবাই. অল্পবিস্তর সমাজসচেতন অতএব জীবনানন্দও যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সেই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। (শুধু মণীন্দ্রবাবুর নয়, বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রগতিশীল সমালোচকদেরও জীবনানন্দ সম্বন্ধে একই ভ্রান্তি ঘটেছে। গতবারে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এ ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে বোধহয় তিনিই একক।) অথচ 'সাতটি তারার তিমির' (জীবনানন্দের এটিই সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ) জীবনানন্দের প্রতিভার সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ পরিণতির উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর, জীবনানন্দের এই সর্বশেষ গ্রন্থ জীবন-রস-উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্যে জীবনানন্দ-বিরোধীদেরও বিস্মিত করেছে। তাঁর কবি-মানস অনেক খণ্ড উপলব্ধির মধ্যে, অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, অনেক সত্যাসত্যের নিত্য সংঘর্ষে এই সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি কোনো দেশে কোনো কালেই আকস্মিক নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে তিনি এমন একটা সময়ের কথা কল্পনা করেছেন

'যখন দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।'

আর, তখনকার অবক্ষয়ী পরিবেশের মধ্যেই তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার পুনরুদ্ধার করলেন, এবং সেইজন্যই মনে হল,

'ভোরবেলা পাখীদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের গানে,'

এই সুস্থ, সবল প্রাণব্যঞ্জনাই চিরকালীন সত্য, নইলে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেই সভ্যতার অবসান ঘটত, 'তা না হ'লে সকলি হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে নিরুদ্দেশে"। রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকারিত্ব অর্জনে জীবনানন্দ যে অসাফল্য অর্জন করেননি তার প্রমাণ উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের দৃঢ় জীবন-নিষ্ঠা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উচ্চারণেও তিনি প্রগতিশীল শিবিরের অন্তর্ভুক্ত,

'সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হোল রক্তে— উপেক্ষায়
বুকের সন্তান তবু নবীন সঙ্কল্পে আজো আসে।'

এশিয়ার বিভিন্ন উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু, সার্থক, সৎ, জীবন-নিষ্ঠ শিল্পীর মতোই আত্ম-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি নির্দ্বিধ। অতীত জীবনের শূন্যচারী উদ্দেশ্যবিহীন কল্পনালোকে পাদচারণের নিষ্ফলতা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। তখন,

'ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই
দেখা গেল পথ আছে—ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে,
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বারবার আমাকে চেনায়।'

সাধারণ মানুষ যে আগামীকালে পথ-প্রদর্শনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এ ধারণা উল্লিখিত অংশে পরিস্ফুট, কিন্তু, মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাগ্রস্ততায় 'আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক'। এ তথ্য নির্ভুল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের সর্বশেষে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত যখন হারানো-পথের সন্ধান লাভ হয়, তখন 'অস্বাভাবিকতা' আর কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম হয় নি, কারণ, চূড়ান্ত উপলব্ধি তার লাভ হয়ে গেছে,

'তবুও নক্ষত্র, নদী সূর্যনারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে, তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গড়ে ভেঙ্গে গড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব,'

এমনকি, শেষপর্যন্ত এ ধরনের চিন্তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো যে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'মানবিক রণ ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন।' অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের দুর্বলতায় জীবনানন্দের পক্ষে নিশ্চয়ই আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই সীমিত আবেষ্টনীর মধ্যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বমানবের সুস্থ, আনন্দময় জীবন যাপনের স্বপ্ন-দর্শনেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

সুতরাং, মণীন্দ্রবাবুর অনুকরণে জীবনানন্দ-প্রতিভাকে এক 'মহৎ-সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি' বলা যুক্তিহীন। অথবা, সামাজিক ব্যবস্থার এক বিশেষ পরিণতি-প্রাপ্তির পূর্বে কোন মহৎ-প্রতিভার পক্ষেও পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব, (এ প্রসঙ্গে শেষ জীবনে রবীন্দ্র-আক্ষেপ স্মরণীয়। সেই হিসেবে জীবনানন্দও নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধ পারিপার্শ্বিককে তিনি নিশ্চয়ই ফাঁকি দেননি।

—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

লেখকের বক্তব্য

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু—

কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আমার আলোচনার প্রতিবাদলিপি পড়লাম। পত্রলেখক অনেক খাঁটি কথা বলেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ কাল্পনিক, তাই উক্ত সুভাষিতাবলী প্রায় অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদের উৎসাহে তিনি আমার আলোচনাটিকে যথেষ্ট যত্নসহকারে পড়েও দেখেননি; তাঁকে আবার পড়তে অনুরোধ করি, ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে গায়ে ব্যথা হবে না তা হলে।

আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতির পর্যায়-ক্রমিক উল্লেখ করে জীবনানন্দ দাশের কাব্যসার্থকতার মানচিত্র রচনা করতে চেয়েছিলাম ঐ আলোচনায়। আবার আলোচ্য কবি যে একটা সাহিত্যিক ভ্যাকুয়ামের মধ্যে কাজ করে যাননি, সেটাও খেয়াল রাখতে চেষ্টা করেছি। তাই প্রথমেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর তুলনা-প্রতিতুলনা উঠেছিল। এবং সেই নজিরেই জীবনানন্দের ভাববস্তুগত তৎকালীন পশ্চাদ্মুখিতার জন্যে সমাজমানসকে দায়ী না করে কবির ব্যক্তিমানসকেই দায়ী করতে হয়েছিল।

এইখানে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে আমার অবশ্য মতভেদ আছে। 'যে কোন ব্যক্তিমানস তার পারিপার্শ্বিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন' এ একটা সাধারণ সত্য মাত্র—ব্যক্তিমানস কতখানি সচেতন তার উপর 'সুস্পষ্ট' প্রতিফলন নির্ভর করে। এবং 'পারিপার্শ্বিকতা'ও তেমন কিছু নির্বিশেষ অবস্থা নয়; যে কোনো সময়েই আমাদের মতো বিমিশ্র সামাজিক অবস্থায় অগ্রবর্তী এবং পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে থাকে। লেখক কোন মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হবেন তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিমানসের প্রস্তুতির উপর। এটা যদি না হতো তাহলে আত্মশুদ্ধির কোনো স্থানই থাকত না সাহিত্যে—কী লিখব, কেন লিখব, এ সব কথাও উঠত না। ইতিহাসের অগ্রগতিতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ দর্শক নয়, সচেতন অংশগ্রহণকারী এটা মনে রাখা দরকার।

পত্রলেখক অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো প্রশ্ন না তুলেও বলতে চাই, রুশ সাহিত্যের আলোচনায় টলস্টয়ের সম্বন্ধে লেনিন যা

বলেছিলেন, তা হয়তো বাংলা সাহিত্যের বিচারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বিষয়েই প্রয়োগ করা চলে ; কারণ আর কোনো কবি-সাহিত্যিকই আমাদের দেশে লেনিনের ধারণামতো 'really a great artist' নন, তাঁদের রচনায় 'important aspects of revolution' খুঁজতে যাওয়াও সব সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। শুধু কে কতটা চেষ্টা করেছেন এবং কে করতে পারেন নি তারই আলোচনা চলতে পারে। এর বেশি করতে গেলেই উল্টো পাকের 'নাসালী ভ্রমে' জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

শ্রীভট্টাচার্যের আরেকটি ক্ষোভের কারণ, তাঁর ধারণা আমি জীবনানন্দের শেষ জীবনের 'প্রগতিশীলতা' 'ফ্যাশান' বলে ধরে নিয়েছি। কারণ আমি বলেছি, 'চল্লিশের যুগে' অন্যান্য কবিদের মতো জীবনানন্দও স্বদেশ ও স্বসমাজের যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের অংশীদার হয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হবার কী আছে? বিশেষ করে শ্রীভট্টাচার্যের মতো সমালোচকের, যিনি মনে করেন, "যে কোন ব্যক্তিমানস পারিপার্শ্বিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন মাত্র"! কবি জীবনানন্দ অন্যান্য কবির অনুকরণে জীবননিষ্ঠার দিকে আগ্রহী হয়েছিলেন, এই স্বকপোলকল্পিত দুশ্চিন্তার বদলে এটা মনে করলেই তো মিটে যায় যে, যে সমস্ত বাস্তব কারণে অন্যান্য সমসাময়িক কবি নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী জীবননিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, সেই কারণগুলিই জীবনানন্দ দাশকেও প্রভাবিত করেছিল। পত্রলেখক শেষের দিকে জীবনানন্দকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার উৎসাহে তাঁর চিঠির প্রথম প্রতিজ্ঞাই ভুলে গেছেন।

অতিবিস্তারে আবশ্যক নেই। সূত্রাকারে সব কথাই আমার সাধ্যমতো ঐ প্রথম আলোচনাটিতে আছে। উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

—মণীন্দ্র রায়

ধুলোমাটি

ননী ভৌমিক

॥ বারো ॥

লাল ধুলোর একটা শহর।

শহরটা এপাশ-ওপাশ করে। রোজগার করে, খরচা করে। ভালোবাসে, ঘৃণা করে। গোঙায়, স্বপ্ন দেখে। তারপর সহসা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে একটা আশ্চর্য মোহময় বিন্দুর দিকে। সে বিন্দুর নাম যুদ্ধ।

একফোঁটা বিষের মতো সে বিন্দু টলটল করে শূন্যে। তারপর স্ফীত হতে-হতে সবকিছু আচ্ছন্ন করে এক অপ্রাকৃত ডানার মতো তীরবেগে নেমে আসে, মিলিয়ে যায়। ছায়া-ছায়া, আর অবাস্তব আর উন্মাদ। মিলিয়ে যায় আর আবার ফিরে আসে। আর অনেক দূরে নরম গালিচার শেষ প্রান্তে, একটা বিবর্ণ মামুলি মূর্তি ফাটা পলেস্তার মতো নড়ে ওঠে,—সম্রাট! সম্রাট! তারপর নড়তে-নড়তে, লম্বা হতে-হতে অপ্রাকৃত একটা ইস্পাতের প্রেত হয়ে ঝনঝন করে এগোয়। ঝনঝন করে বেজে ওঠে ইস্পাতের আর-একটা প্রেতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অপ্রাকৃত এক ধাক্কায়। আর নির্ভুল যান্ত্রিকতায় একটা অচেনা নগর হঠাৎ ছাই হয়ে হাঁপায়। একটা অচেনা ক্ষোভ হঠাৎ নোঙরা হয়ে ওঠে মানুষের ছেঁড়া-ছেঁড়া মাংসের ডেলায়। যুদ্ধ। অদ্ভুত একটা সত্য। অদ্ভুত একটা অবাস্তবতা। সাতসমুদ্রপারের, সাতসমুদ্র-পার-হয়ে আসা একটা ছায়ায়। আর আগুনলাগা একটা দুর্গের নিচতলার বাসিন্দা হ্যালা-বোকা ধাড়ি একটা খোজা গোলামের মতো মফস্বল শহরটা মাঝে মাঝে হি-হি করে হাসে। মাঝে-মাঝে ঝিমোয়। মাঝে মাঝে গুজব শোনে আর গুজব শোনে আর গুজব শোনে।

তারপর একদিন চমকে ওঠে। ও কী! ও কারা!

লালধুলোর একটা রাস্তা। রাস্তাটা মোচড় খেতে-খেতে বেঁকে গেছে

শালবনের দিকে, গ্রামের দিকে, ঝাড়ের বুকের দিকে। সেই রাস্তা দি অস্পষ্ট গর্জনের মতো কী একটা এগিয়ে আসছে। এলোমেলো আকৃতি মতো কিছু একটা নড়ে উঠেছে। একটা মিছিল। মিছিল—কিন্তু এ শহ আরো অনেকবার যে মিছিল দেখা গেছে, সে মিছিল নয়। যে মিছিল কোনে দিন দেখা যায় নি, সেই মিছিল, চাষীর মিছিল। পা ফেলতে শেখে নি এখনো, লাইন মেলাতে শেখে নি। তবু আসছে। বুড়ো, জোয়ান, তামাটে কালো, সাঁওতাল সদ্‌গোপ, জাত-বেজাত চাষা। ফাটা-ফাটা খালি পা তাদের ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে আসা ধুলোয়। হাতে কারো লাঠি, কারো হাতে কাঁড় ধনুক। পিঠে কারো গামছায়-বাঁধা মুড়ি, কারো বগলে তালিমারা ছাতি। আর মিছিলের সামনে আশ্চর্য অপরিচিত একটা নিশান,—কেমন সর্বনাশা লাল রঙের একটা ঝাণ্ডা। সাহেবের কাছে সাঁওতালী নাচ দেখাতে নয়, আদালতের ডিক্রি শুনতে নয়, জমিদারবাড়িতে দণ্ডবৎ করতে নয়। স্থূল হাতের মুঠোয় এলোমেলো আনাড়ি এক উত্তেজনা জাগিয়ে, চৌকো বয়স্ক ঝড়দাগা মুখগুলোয় অদ্ভুত এক স্বপ্ন কাঁপিয়ে, ভাঙা-ভাঙা হেঁড়ে গলায় অনভ্যস্তের মতো চিৎকার করতে-করতে এগিয়ে আসছে— লড়াইয়ের লেগে —না এক পাই! না এক ভাই! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! লাঙল যার, জমি তার। বলো ভাই, লাল ঝাণ্ডা কি—জয়!

শহরের দোকানদারেরা স্বাভাবিক চাপল্যে হাসতে গিয়ে হঠাৎ হাসতে পারে না আর। ভদ্র দর্শকেরা বিজ্ঞ দু-একটা মন্তব্য করতে গিয়েও হঠাৎ হাঁ করে চেয়েই থাকে। এ কী! কী এর মানে? কী শুরু হবে এবার?

পূর্ণচন্দ্রও দেখছিলেন মিছিলটা। হঠাৎ চমকে উঠলেন—মিছিলের সামনে হাঁপাতে-হাঁপাতে যে-লোকটা হাঁটছে, তাকে তিনি চেনেন। সেই রমেশবাবু না? আদালতে শিবুদের সঙ্গে একই কাঠগড়ায় দেখেছিলেন লোকটাকে, তাঁরই বাড়িতে লুকিয়েছিল কয়েকদিন তাও টের পেয়েছিলেন, সেই লোকটা!

আর তার চেয়েও চমকে উঠলেন আর-একটা লোককে দেখে। একটা চাষী। না, চাষী আর নয় ভাগচাষী। না, ভাগচাষীও আর নয়—পূর্ণচন্দ্র তাকে ছুটিয়ে দিয়েছেন জমি থেকে। একটা হাভাতে উচ্ছন্ন চাষী বনমালী। ফাটা-ফাটা খালি পা। মাথার কাঁচাপাকা চুল এখন একেবারে শাদা হয়ে গেছে। বগলে একটা পুঁটলি। দুই জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনমালীও

চেঁচাচ্ছে, লাঙল যার, জমি তার। ধূসর চোখ দুটো জ্বলছে এক সমবেত ভয়ঙ্কর স্বপ্নের নেশায়।

লাঙল যার জমি তার? তার মানে? পূর্ণচন্দ্র সন্দিগ্ধের মতো জিগ্যেস করেন পাশের একটি লোককে—তার মানে জমিদারের জমি নয়? যে মনে করো টাকা দিয়ে কিনল, তার জমি নয়?

'তাই তো বলছে মাশায়!' দর্শকদের মধ্যে থেকে হাড়ি-বাউড়িদের একটা ছেলে বিনীতভাবে বলে, আর পূর্ণচন্দ্রের চোখের সামনেই কেমন উৎসুক উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'তাই কখনো হয়? আইন কোথায়?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন পূর্ণচন্দ্র, আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কেমন যেন মনে হয় তাঁর, হয়তো তাও হবে, হয়তো তাই হবে। এ মিছিলের মধ্যে এমন কী একটা যেন ছাইচাপা আগুনের মতো উসকিয়ে উঠেছে, যাতে মনে হয় তাই হবে একদিন।

কিন্তু কেন হবে? পূর্ণচন্দ্র উত্তেজনায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। ইচ্ছে হয় কারো সঙ্গে তর্ক করেন তিনি। মোহিনীদেবীর সঙ্গে করেন। এ যেন আর কারো নয় মোহিনীদেবীরই চক্রান্ত। তাঁরই জিদটা মিছিল হয়ে এসেছে। কিন্তু ও তো আমার জমি! আইনত আমার!

অস্থিরভাবে পূর্ণচন্দ্র বাড়ি ঢুকতেই মোহিনীদেবী আস্তে বেরিয়ে আসেন বৈঠকখানা থেকে। বলেন, 'বাবাকে দেখবেন একবার? উনি বোধহয়—'

মিছিলের কথাটা আর তোলা হয় না। 'কেন, কী হয়েছে?'

মোহিনীদেবী ছাড়াছাড়াভাবে জানান ঘটনাটা। শিবু ফেরার পর থেকে উনি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে ওই কাপাসচারাগুলোর পেছনে লেগেছিলেন। নিত্য নতুন কবিরাজী সার আর আড়ক দিয়ে ওদের পরিচর্যা চলছিল। কয়েকদিন আগে একটা কুঁড়িও দেখা গেছে। উত্তেজনায় সেদিন থেকে রোজই একটু বেশি পরিমাণে মদ খেতে শুরু করেছিলেন। আজ ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে শোনেন, ফিসফিসিয়ে ডাকছেন, 'বৌমা আসো তো একটু। উঠবার পারতেছি না—'

মোহিনীদেবী ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু খানিক

পরেই ধপ করে একটা শব্দ শুনে দেখেন, রামচন্দ্রবাবু আবার গড়িয়ে পড়েছেন বিছানায়। মোহিনীদেবীর প্রশ্নের উত্তরে কোনো জবাব দিতে পারেন না। শুধু বোঝা যাচ্ছিল অশীতিপর একটা হাড়ের খাঁচা বিছানার সঙ্গে লেপটে কী যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা সইতে চেষ্টা করছে। ডাক্তার দেখে গেছে একবার, কিন্তু কী হবে তাতে?

'যখন কথা কইতে পারলেন তখন আপনাকে খোঁজ করছিলেন!'

'আমাকে!' পূর্ণচন্দ্র বিহ্বল হয়ে পড়েন একেবারে। এতদিন পরে নিজে থেকে রামচন্দ্রবাবু তাঁর পুত্রকে ডেকে পাঠালেন! এতদিন পর অভিমান গেল তার!

আড়ষ্ট পায়ে পূর্ণচন্দ্র রামচন্দ্রের ঘরে ঢোকেন। অনেকক্ষণ পরে যখন ফেরেন তখন কেমন স্তব্ধ মনে হয় তাঁকে।

'কেন ডেকেছিলেন জানো? উইল করে রেখেছেন, তাই পড়তে বললেন। যে বাড়িখানায় আছি এটাও উনি আগেই বিক্রি করে রেখেছেন লছমীদাসের কাছে, কাউকে জানান নি। এই সব ওঁর এক্সপেরিমেন্টের নেশায়। সব মিলিয়ে নগদ আছে বোধহয় গড়ে তিন হাজারের মতো। তার পাইপয়সা হিসাব করে দিয়েছেন কিসে খরচ করতে হবে—নিজের শ্রাদ্ধের খরচটা, পুরুতের খরচটা পর্যন্ত। বাকি টাকার এক লম্বা ফর্দ আছে। যদি তাঁর রঙিন কাপাস সত্যিই ফলে, তবে সে টাকাটা দিয়ে তার চাষ করতে হবে শিবুকে। যদি না ফলে তবে এতদিন ধরে যে-সব ছুতোর-মিস্ত্রি-তাঁতীর সঙ্গে পাগলামি করেছেন তাদের নামে নামে টাকাটা ভাগ করে দিয়েছেন। আমাদের জন্যে কিছু না, এমনকি বাড়িখানা পর্যন্ত প্রাণে ধরে রেখে যেতে পারেন নি। উইলে লিখেছেন, 'অপরের উপার্জিত ধনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা আমার পুত্রকন্যাদিগের উচিত হয় না। তাহারদিগকে আমি আশীর্বাদ করিতেছি।'

পূর্ণচন্দ্র একটু দম নেন। চোখ দুটো বুঝি জ্বালা-জ্বালা করে তাঁর। তারপর আচমকা উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আর তিন শ টাকা ফুলমতিয়া অবর্তমানে তার বংশধর যদি কেউ থাকে তার জন্যে—'

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে আসে বাড়িটা। বহু দূরের চাপা-পড়া অতীত থেকে একটা নাম উঠে এসে সহসা স্তব্ধ করে দেয় সবাইকে। একটা

নাম, নাকি একটা কলঙ্ক? নাকি একটা উন্মত্ততা? এ বাড়ির বর্তমান কেউ তা জানে না। পূর্ণচন্দ্র ভেবেছিলেন আর কেউ জানবে না। কিন্তু মারা যাবার ঠিক আগে নিজে হতেই রামচন্দ্রবাবু আবার তা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে গেলেন।

পূর্ণচন্দ্র তখন ছোটো, তবু জানতে হয়েছিল তাঁকে। যন্ত্র বানাবার নেশা রামচন্দ্রবাবুকে তখনো এতটা পেয়ে বসে নি। ইংরেজী কাব্য তখনো তাঁর প্রিয়। অথচ কাব্যে যা পেয়েছেন জীবনে তা পাওয়া হয়ে উঠছে না। স্ত্রী সেবা করেছে, মুগ্ধ করতে পারে নি। সেই সময় এসেছিল ফুলমতিয়া—আদালতের এক পিয়নের সদ্যবিধবা। রামচন্দ্রবাবুর আশ্রয় চেয়ে বলেছিল, বাঁচান বাবুজী! বিলাতী হাকিম পিয়ারসন সাহেব নাকি তাকে রাত্রে কুঠি যেতে হুকুম করেছে।

রামচন্দ্রবাবু হাকিম ছিলেন না, হাকিমের কর্মচারীমাত্র। তাই সর্বনাশের ভয় ছিল সমূহ। তবু মেতে উঠলেন ফুলমতিয়াকে বাঁচাতে। তার জন্যে আলাদা একটা ঘর ঠিক করে দিলেন নিজের খরচায়। আর তারপর নিজেই মেতে উঠলেন নতুন এক মাদকতায়—ফুলমতিয়ার মাদকতা। বালক পূর্ণচন্দ্রকে অনেক দিন ফুলমতিয়ার বাড়ি থেকে ডেকে আনতে হয়েছে রামচন্দ্রকে অনেক দিন দেখতে হয়েছে, নিরক্ষরা ফুলমতিয়ার ঈষৎ মুগ্ধ ঈষৎ বিব্রত দৃষ্টির সামনে আত্মবিস্মৃত নেশায় জড়িত কণ্ঠে ইংরেজী কাব্যের লাইন আবৃত্তি করে চলেছেন মধ্যযৌবনের রামচন্দ্র।

লোকনিন্দা হয়েছিল। সংসারে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, পিয়ারসনের কানে খবর পৌছতে দেরি হয়নি। কিন্তু রামচন্দ্রবাবু বন্ধুদের সদুপদেশে কান না দিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, 'পিয়ারসন তাঁর কামরায় পিয়ারসন। কামরার বাইরে পিয়ারসনও মহারানীর প্রজা, আমিও মহারানীর প্রজা। দেখতে চাই কে জেতে!'

শেষ পর্যন্ত সংঘাত একটা বাধল, কিন্তু অন্যদিক থেকে। পিয়ারসন বোধহয় সত্যিই মহারানীর খাঁটি প্রজা। তাই রামচন্দ্রবাবুর ওপর হুমকি না দিয়ে হুমকির পরিমাণ বাড়ালেন ফুলমতিয়ার ওপর। তারপর ফুলমতিয়ার শূন্য ঘর থেকে রামচন্দ্রবাবু ফিরে এলেন কেমন একটা হাহাকার-করা হাসি নিয়ে। বন্ধুবান্ধব যাকে পেলেন তাকেই ডেকে ডেকে অকারণে শোনাতে

লাগলেন, যাক্‌, তিনি বেঁচে গেলেন। পিয়ারসনের সঙ্গে লড়ে সর্বনাশ হই
হল না তাঁকে। ফুলমতিয়া তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজেই ইচ্ছে করে চলে গে
পিয়ারসনের কুঠিতে আয়া হবার জন্যে—

তারপর থেকে ফুলমতিয়ার নাম এ বাড়িতে আর কেউ কখ
শোনে নি।

স্তব্ধতা ভেঙে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রের গায়ে হাত বুলোতে শুরু কর
মোহিনীদেবী। আর সচকিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র টের পান তাঁর জ্বালা-জ্বালা চো
দুটো কখন ভিজে উঠেছে। রামচন্দ্রের জন্যে কখন তিনি কাঁদতে শুরু করেছে
ছেলেমানুষের মতো। 'উনি—উনি—উনি আমার বাবা! কিন্তু কেউ ওঁ
কোনো দিন বুঝতে পারল না। কেউ না। আমিও না। না আমিও বুঝি না—

মোহিনীদেবীর নীরব হাতখানা আরো ঘন হয়ে আসে পূর্ণচন্দ্রে
পিঠের ওপর। ধীরে ধীরে বলেন, 'পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে ডাক্ত
ডেকে এনেছিলাম। কী দু-একটা ওষুধ দেবে বলেছে। সেগুলো নে
নিয়ে আসতে হবে—'

ওষুধ নিয়ে যখন ফিরে আসেন তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। অন্দরে
মধ্যে মোহিনীদেবী ছাড়াও আরো কয়েক জন নিচু স্বরে কথা কইছে
একেবারে কাছে এসে লোক চিনতে হয় পূর্ণচন্দ্রকে। সত্যবাবু আ
সেই রমেশবাবু, সেই যে লোকটাকে আজকেই দেখে এসেছেন মিছিলে
সেই যে লোকটা তাঁর এই বাড়িরই দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিল গোপনে

'ওষুধ নিয়ে এসেছেন?' কেমন দুর্বল শোনায় মোহিনীদেবীর গলা
আওয়াজ। যেন আরো কী বলতে গিয়ে দম নিয়ে থেমে যান। তারপ
ফিসফিস করে ওঠেন, 'শিবু আবার গ্রেপ্তার হয়েছে। আজ আবা
হাজিরা দিয়ে আসার দিন ছিল। সেখান থেকে আর ছাড়ে নি।' সত্যবা
খবর এনেছেন।'

'আবার? আবার কেন? ও তো—'

মোহিনীদেবী উত্তর দেন না। উত্তর দেন রমেশবাবু, 'না, এবার ও
এখনো পর্যন্ত কিছু করে নি। কিন্তু যুদ্ধ যে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলস
শুধু ও নয়, আরো কয়েকজনও গ্রেপ্তার হয়েছে। শুনছি আমার নামে
ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট আছে।'

সত্যবাবু সায় দেন, 'নাকি নয়, আছে। এই সবে ছাড়া পেল। দু দিন যেতে না যেতেই আবার সেই ধরপাকড়, অর্ডিন্যান্স। আপনাকে আমি জোর করে সরিয়ে না রাখলেও আপনিও যেতেন। এ এক আচ্ছা দেশ হয়েছে যা হোক। স্বাধীনতার জন্যে এত বিরামহীন জেলখাটা আর কোনো দেশকে খাটতে হয়েছে বলে আমি তো শুনি নি।

'যুদ্ধের আগে ইংরেজ যতই শাসন সংস্কার করুক, যুদ্ধের সময়ে ওরা একেবারে খাঁটি জনবুল। আমরা অনেকেই ভাবছিলাম, রক্ত যা কিছু ঝরছে তা তো পোল্যাণ্ডে। কিন্তু পৃথিবীটা যে কতখানি এক হয়ে এসেছে সে খেয়াল হয় নি অনেকের। আমাদের এখনো গ্রাম জ্বলে ওঠে নি বটে, কিন্তু সিভিল লিবার্টি পুড়ে গেল। এরপর আরো যে কত কী পুড়বে, তাই ভাবছি। শুনছি হকার্ট নাকি আবার ফিরে আসছে। এবার শুধু এ জেলাটা নয়, গোটা ডিভিশনটার চার্জ নিয়ে।'

নইলে চুপ করে থাকতে হয়, আর সে চুপ করে থাকা যে এবাড়িতে এই মুহূর্তে আরো অসহ্য হয়ে উঠবে, তা যেন সকলেই জানে। তাই টুকিটাকি কথা চালিয়ে যান রমেশবাবু। আর কথা কইতে কইতেও লক্ষ্য করেন, মোহিনীদেবী পাথরের মতো স্থির হয়ে আছেন।

হঠাৎ দরজা খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ায় প্রতিমা। বোঝা যায়, আজ সে গা ধুয়েছিল। চুলটাও বুঝি আঁচড়েছিল যত্ন করে। ছুটে আসতে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে, তবু সেই এলানো চুলের মধ্যে আধখসা লেগে আছে কয়েকটা ফুল। কপালটা ম্লান হয়ে উঠেছে উদ্বেগে তবু সেই কপালের মাঝখানে গোধূলির আভায় চিকমিকিয়ে উঠেছে একটা নতুন-আঁকা কুমকুমের টিপ। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রতিমা এসে দাঁড়ায় একেবারে মোহিনীদেবীর বুকের কাছে: 'কাকীমা, যা শুনছি সত্যি?'

মোহিনীদেবী উত্তর দিতে পারেন না। শুধু একটা খাপছাড়া আবেগে বুকের মধ্যে সজোরে জড়িয়ে ধরেন প্রতিমাকে। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো বিচ্ছিরিভাবে বেঁকে যায় তার। 'ভেবেছিলাম তোকে বউ করে এবার বুঝি ঘরে আনতে পারব। কিন্তু—'

প্রতিমা ধীরে ধীরে মুক্ত করে নেয় নিজেকে। তারপর অস্বাভাবিক

স্থির গলায় শুধু একবার শুধায়, 'তাহলে সত্যি! কতদিন আটক রাখ
রমেশদা?'

'কতদিন? এবার তো আর বিচার নয়, ওদের ইচ্ছা। হয়তো এ
বছর দু বছর, হয়তো পাঁচ বছর ছ বছর—যতদিন যুদ্ধ চলবে।'

'পাঁচ বছর ছ বছর?' অস্ফুটস্বরে গুনগুন করে প্রতিমা। যেন ম
কী একটা হিসেব করে। তারপর চুপ করে বসে থাকে। বসে থাকে
রূপ-খুইয়ে-বসা এক আইবুড়ো মেয়ে। আরো পাঁচ বছর, ছ বছর? আর
পাঁচ বছর ছ বছর পরে দেবার মতো কী থাকবে সে মেয়ের?

রমেশবাবু আস্তে আস্তে ওঠেন। 'চলুন সত্যবাবু, ওঠা যাক। অনে
দূর যেতে হবে।' কিন্তু দু-এক পা এগিয়ে নিজেই আবার মাথা নি
করে পাঁজর চেপে বসে পড়েন।

'এই দেখুন আবার! ঐ আমনাকে নিয়ে ক্যামন করে যাওয়া যার
গো। আগে ডাক্তার দেখাইলেন না। এখন আবার ফেরারি হয়ে ঘুরতে
হবে আমনাকে। ই অবস্থায় কাকে দেখাইবেন?'

রমেশবাবু হাতের ইশারায় ব্যস্ত হতে মানা করেন সত্যবাবুকে। ফি
মেরে বোধ হয় শুধু মনের জোরেই যন্ত্রণাটাকে কব্জা করার চেষ্টা করেন
অনেকক্ষণ পরে দম নিয়ে ম্লানভাবে হাসেন, 'এটা আমার জেলখানা
উপার্জন। শরীরের দু-একটা যন্ত্রই বোধহয় বেশ বিকল হয়ে গেছে। ও আর
সারবে না। যে পরিমাণ বিশ্রাম আর টাকা হলে হয়তো একবার শরীরটাকে
কাটাকুটি করে খানিকটা মেরামত করে নেওয়া যেত, তা ভেবে মিছে
মন খাঁরাপ করে কী লাভ বলুন? ঠিক আছি। এবার বোধহয় হাঁটতে
পারব। চলুন—'

ম্লানভাবে হাসেন রমেশবাবু, অন্যের উদ্‌বেগ বাতিল করে কথা বলতে
চান। তবু কানে লাগে। সযত্নে-চাপা একটা কোঁকানি যেন তা সত্ত্বে
আটকাতে পারা যাচ্ছে না। এই অবস্থাতেই হাঁটবে মানুষটা? হাঁটতে
হাঁটতে ধুলো আর অন্ধকার আর বিপদের মধ্য দিয়ে ফিরে যাবে ক্রোশের
পর ক্রোশ ছাড়িয়ে যাওয়া সেই দারিদ্র্যের মধ্যে, যেখানে শক্তির মন্ত্র খুঁজে
পেতে হবে তাঁকে?

মোহিনীদেবী এতক্ষণ পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিলেন। এবার

এগিয়ে এসে একেবারে সামনে দাঁড়ান রমেশবাবুর। পথ আগলে বলে ওঠেন,
'দাঁড়ান! আপনি! আপনি যতবার এসেছেন আমার জন্যে শুধু সর্বনাশই
নিয়ে এসেছেন! তবু বলি, যদি বিপদ না থাকে, তবে আজ রাতটা
এখানেই থেকে যান—'

রমেশবাবু হাসলেন, 'আমি জানতাম আপনি সত্যিকারের মা হবেন
একদিন। আমাকেও খাঁটি দেশের ছেলে হতে হবে যে!'

'কিন্তু এই কি হওয়া? এ কেমনধারা হওয়া! এত তাজা-তাজা ছেলে,
এত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, এত সুন্দর-সুন্দর মানুষ এ সবকিছুকে নষ্ট করে, নষ্ট
হতে দিয়ে কী করলেন আপনারা! কী করলেন আপনি—হ্যাঁ আপনি!'

'ঠিক বলেছেন মা, এদেশের দুর্ভাগ্য তারা নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু একবার
ভেবে দেখুন তো মা, এত তাজা-তাজা ছেলে আমাদের দেশে। এত
ভালো-ভালো মেয়ে। এত সুন্দর-সুন্দর লোক! ধাত্রী মেলে নি, তবু এত
অপূর্ব যন্ত্রণা! শিকড়ে পৌছয় নি, তবু এত আশ্চর্য স্বপ্ন। আমার কথা
জিগ্যেস করছেন? সেই জন্যেই তো ভাবছি, ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে
এ কেবল ধুলোর ঝড়েই হেঁটে বেড়ানো সার হলো, যদিও সে ধুলোটা রক্তের
ধুলো। আজ এতদিন বাদে মনে হয় মাটি পেয়েছি অথচ আমার নিজের
খাটবার শক্তি শেষ হয়ে এসেছে। তাই শেষ শক্তিটুকু আর নষ্ট হতে দিতে
চাই না।' কখন গভীর হয়ে এসেছিল রমেশবাবুর গলা। সেই গভীরতাকে
অল্প একটু লঘু করে সত্যবাবুর দিকে তাকান, 'তবে একটা জিনিস কিন্তু লাভ
হয়েছে সত্যবাবু, ঘৃণা করতে শিখেছি। এ দেশটা এত দিনেও বোধহয়
যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা করতে জানত না। এবার জানবে। আর আপনার
কাছ থেকে একটা জিনিস শিখতে হবে আমাকে। আত্মত্যাগটা জানতাম,
এবার শিখব আত্মীয়তা। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন না সত্যবাবু?
আমাদের সঙ্গে থাকবেন না?'

সত্যবাবু অন্যমনস্কের মতো সায় দেন, 'আপনার সঙ্গে না থাকলেও
চাষীদের সঙ্গে না থেকে কোথায় যাব? ওই হাই কম্যাণ্ডের কাছে? না।
আমি তো আসলে চাষা। হয়তো সেই জন্যেই ধর্মের মতো কিছু না পেলে
যেন মন ওঠে না। সে তো আপনি দিতে পারেন না। দিতে পারতেন একটি
লোক—তিনি গান্ধিজী। ওই একটি লোকই অন্তত একবার আমাদের

মতো লোকের দিকে তাকিয়েছিলেন; গাঁয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। আর যদি না তাকান ক্ষোভ থাকবে, কিন্তু কৃতজ্ঞতা খোয়াতে বলবেন না রমেশবাবু।'

সত্যবাবু রমেশবাবু ধীরে ধীরে খিড়কির দরজার দিকে এগোতে থাকেন। সদর দরজার রাস্তা তাঁদের বন্ধ হয়ে গেল কত দিনের জন্যে কে জানে। আর তাঁদের পিছু পিছু নিঃশব্দে, যেন জানাই আছে এমন নিশ্চিন্ত ধীর পায়ে এগিয়ে আসে প্রতিমা।

'প্রতিমা তুমি? কোথায় চলেছো?'

অন্ধকারে অদ্ভুত শান্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, এক আইবুড়ো মেয়ের শান্ত গলা, 'আমাকে সঙ্গে নেবেন না রমেশদা? বাড়ির মধ্যে বসে-বসে কেমন করে কাটাবো? আপনাদের কাজে ভাগ দিন। নইলে ছ বছর পরে শিবুদাকে দেবার মতো কী থাকবে আমার!'

খিড়কির দরজা দিয়ে তিনটে মূর্তিই ধীরে ধীরে মিশে যায় বাইরের অন্ধকারে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি এসে থামে সদর দরজায়। খুকি এতক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে ছিল একটু দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কিছুদিন থেকে অমনি নিঝুম হয়েই সে থাকছে সারা দিন। ঘোড়ার গাড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ ত্রস্তে উঠে যায় দরজার দিকে, তারপর ফিরে এসে অস্ফুট স্বরে মোহিনীদেবীকে বলে, 'মা, ও এসেছে! সেই অমল! এ বাড়িতে ঢুকতে মানা করেছিলাম, তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। না না, ওর সঙ্গে যা ভাবছ, এখনি তা নয়। ও আমাকে পৌঁছে দেবে। নার্সিংএ ঢোকার একটা ব্যবস্থা ও করে রেখেছে, সেইখানেই থাকব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। যাব? তুমি নিজে মুখে একবার বলো, যাব?'

মোহিনীদেবী চমকান কিনা বোঝা যায় না। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে খুকির গায়ে হাত বুলোতে থাকেন, 'যাবি? নিজের পায়ে দাঁড়াবি? তবে যা, যদি পারিস দাঁড়া। তোর ঠাকুরদাদের কালে ভালোবাসা বইয়ে পড়া যেত, জীবনে পাওয়া সম্ভবই হত না। আমাদের কালে আমরা পেয়েছি ভাগ্যের দান হিসেবে। দেখছি, তোদের কালে ভাগ্যের সে দানটাও অচল হয়ে গেল। হয়তো এই ভালো। ভালোবাসা অর্জন করাই হয়তো সবচেয়ে মঙ্গল। তবে যা, আমিও বলছি যা—'

পূর্ণচন্দ্রের কাছে খুকির ঘটনাটা স্পষ্ট করে এতদিনও বলা হয় নি। খুকিকে যেতে দেখে তিনি চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও কি! কোথায় চলল ও?'

ঠোঁট চেপে আপন মনে মোহিনীদেবী বলেন, 'ওর ভাগ্যের কাছে।'

তারপর অদ্ভুত শূন্য হয়ে যায় বাড়িটা! অদ্ভুত রকমের খাঁ-খাঁ-করা ঝিঁঝি-ডাকা ফাটল-ধরা। আর অদ্ভুত খালি-খালি লাগে বুকের ভেতরটা। খালি খালি অথচ কেমন যেন ভরাট! অনেকদিন আগে পূর্ণচন্দ্র অবাক হয়ে তাঁকে জিগ্যেস করতেন, কী চাও তুমি বলো তো, কী চাও! মোহিনীদেবী নিজেও জানতেন না কী চাইছেন তিনি। একটা মেয়ে যতদূর বেড়ে উঠতে পারে ততদূর বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। পূর্ণচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে বলতেন, তিনি সুন্দর হচ্ছেন, পনেরো বছরেও সুন্দর, পঁয়ত্রিশ বছরেও সুন্দর। কিন্তু তারপর? তারপরেও কিছু একটা হতে চাইতেন তিনি, নিজেও তা জানেন নি। আজ হঠাৎ মনে হয় তিনি জানেন। তিনি মা হতে চাইছিলেন। রমেশবাবুর কথাটা যেন অশ্রুত একটা গুঞ্জনের মতো মন ভরে তুলতে থাকে তাঁর। কথাটা যেন বড়ো হতে-হতে শূন্য ঘরখানাকে ভরে ফেলে। তিনি মা। শিবুর মা, খুকির মা, রমেশবাবুও মা। প্রত্যেকের মধ্যেই কেমন যেন একটা অসহায়তা আছে। তিনি ছাড়া দেখবার কেউ নেই, আরাম দেবার কেউ নেই। তিনি এগিয়ে দিলে তবে ওরা সবচেয়ে ভালোভাবে এগুতে পারবে! তিনি সান্ত্বনা দিলে তবে ওরা সবচেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

'এতদিন বাদে এইভাবেই তাহলে শেষ?' অন্ধকারে কেমন ঝিম-ধরা শোনায় পূর্ণচন্দ্রের প্রৌঢ় কণ্ঠস্বর। আর, অস্পষ্টভাবে মনে হয় মোহিনীদেবীর—সকলেরই মা তিনি, বোধ হয় এই লোকটারও মা। পূর্ণচন্দ্রেরও মা। যেন অনেক ছোটো, অনেক অসহায় কাউকে আরাম করে তুলছেন এমনিভাবে আরো ঘন হয়ে আসেন পূর্ণচন্দ্রের দিকে। অন্ধকারে তাঁর সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'হয়তো এইভাবেই আর একটা শুরু।'

'কিন্তু কী নিয়ে শুরু? কী রইল আমাদের? কেরানিগিরি শেষ

হয়েছে। জমিটুকু ছিল, আজকের মিছিল দেখে মনে হচ্ছে সে ভরসাও বোকামি। তাহলে কী নিয়ে শুরু ?'

'ভালোবাসা নিয়ে। অন্যদের চেয়ে এই একটা দিকে আমরা ভাগ্যবান। তাছাড়া আমিও তো রোজগার করছি, আপনিও খাটতে পারেন—'

শিশুর মতো পূর্ণচন্দ্র আরো কাছ ঘেঁসে আসেন মোহিনীদেবীর। শিশুর মতো চোখ মেলে আরো কিছু যেন শুনতে চান তিনি। আশ্চর্য এমন কিছু। রূপকথার মতো এমন কিছু। বলেন, 'কতোদিন তুমি কবিতা আওড়াওনি। একটা বলবে ? তোমার রবিঠাকুরের কবিতা ?'

মোহিনীদেবী চুপ করে থাকেন, 'আজকে বলার মতো কবিতা হয়তো তিনিই লিখতে পারতেন। কিন্তু এদিকে ঐ যুদ্ধ, আর ঠিক ঐ সময়েতেই উনি শয্যা নিয়েছেন।

তারপর ধড়মড় করে ওঠেন মোহিনীদেবী। কাজ পড়ে আছে। অনেক অনেক কাজ! আলোটা জালতে হবে বৈকি। সেলাইগুলো নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে। অন্য আর কোনো কাজ করতে পারেন তিনি দেখতে হবে চেষ্টা করে। আর রামচন্দ্রবাবুকে গিয়ে দেখতে হবে। আর—

আর এতক্ষণে হঠাৎ মনে হয় বীরু নেই। আজ দুদিন থেকে বীরু বাড়ি আসেনি। কোথায় গেল ছেলেটা ? ওই এক ছেলে! ও যেন বাড়ে! যেমন করে পারে, যেদিকে খুশি ও যেন বেড়ে ওঠে!

দরজায় আবার টোকা পড়ে। এবার লছমীদাস। রামচন্দ্রবাবুর অসুখ শুনে খবর নিতে এসেছে। না, না, ওঁকে কিছু বলার দরকার নেই! এখনো ভালোই আছেন তাহলে। সেইজন্যেই আসা।" না, না, বাড়িখানার অবশ্য ওই এখন মালিক। কিন্তু ছি, ছি। সে তো রামচন্দ্রবাবুকে বলেই রেখেছে যতদিন উনি বেঁচে থাকবেন লছমীদাস এ বাড়িতে হাত দেবে না। আর সময়ই বা কোথায়! লড়াইয়ের বাজার, যত ঝামেলা! সেই সব দেখতেই সময় চলে যাচ্ছে। ভালো আছেন তাহলে!

রামচন্দ্রবাবুর বিছানার কাছে যেতে অস্ফুটস্বরে তিনি শুধু জিগ্যেস করেন, 'বৌমা ?'

'হাঁ।'

'কছিলাম কি কাপাসের ঐ কলিটা দেখছ নাকি ?'

একটু থেমে মোহিনীদেবী বলেন, 'দেখেছি।'

'ফুটছে ?' অশীতিরপর হাড়ের খাঁচাটার ভেতরে শ্লেষ্মার একটা উত্তেজিত টান অনুভব করা যায় স্পষ্ট করে, 'রঙ দেখা যায় কিছু ?'

মোহিনীদেবী মুখের মধ্যে আঁচল চেপে বানিয়ে বানিয়ে বলেন, 'হাঁ, দেখা যাচ্ছে। একটু লাল রঙই যেন মনে হচ্ছে।...'

'তবে তো হছে-এ-এ—' অস্পষ্ট বিকৃত উচ্চারণে গভীর ঘড়ঘড়ে গলায় রামচন্দ্রবাবু ফিসফিস করতে থাকেন, জীবনে তবে তো একটা কাম হছে-এ-এ—'

আর কানা চোখের কোণ দিয়ে ধীরে ধীরে জল গড়িয়ে আসে তাঁর।

স্টেশনের পথে লাল ধুলো উড়োতে উড়োতে একটি লোক হাঁটছে। গায়ে তার এক বিদেশী কাটের গরম কোট। বিদেশী কাট—কিন্তু পুরনো আর ছেঁড়া-ছেঁড়া আর কাদামাটি-নোঙরা-লাগা। পায়ে তার একজোড়া বিদেশী বন্দরে কেনা আধুনিক জুতো। আধুনিক, কিন্তু বহু ব্যবহারে থেবরে-যাওয়া, ফিতে-ছেঁড়া, আঙুল-বেরিয়ে-পড়া। পরনে লুঙ্গি, বগলের নিচে একটা তেল-চিটে প্রকাণ্ড রুমালে বাঁধা ছোট্ট একটু পুঁটুলি। পেছন থেকে দেখা যায় বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে হাঁটছে লোকটা। নুয়ে পড়ে আর দুলে দুলে, জাহাজীরা যেমন করে হাঁটে। আর হিল-ক্ষয়ে-যাওয়া জুতোর ধাক্কায় ধাক্কায় কুয়াশার মতো লাল একটা ধুলোর রেশ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে বাতাসে।

পেছন থেকে বীরু এসে সঙ্গ ধরে লোকটার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'তুমি কলকাতা যাচ্ছ আবার ?'

ইয়াসিন তার কোঁচকানো ধূসর সুর্মা-উঠে-যাওয়া চোখজোড়া তুলে বলে, 'ওই খোঁকাবাবু যে! হাঁ খোঁকাবাবু চললম কলকাতাতেই বটে। ভেঁবে-ছিলাম বুড্ডা হঁয়ে গেলাম। আর দরিয়ায় যাব না। লেকিন আমার বেটা আবদুল—উয়াঁরা তো কাজ লিয়েছে রানীগঞ্জের কলে। বলে, বাজান ই হপ্তায়

যা মিলছে তা নিজেদের পেটে দিব না তুমাকে খাওয়াইব! তো কাকে কি বলবে বলো? ব্যাটাকেই বলবে কি শালা চুথিয়া কোম্পানিটোকে বলবে! তো বসেই ছিলাম—শালা যা আছে খেঁয়ে লাও পরে দেখা যাবে। তা এই ছাখো ক্যানে তলব পাঠিয়েছে জাহাজ হতে। বললম আর যাব নাকো, বুড়া হঁয়েছি, ডাঙাতেই কবর লিব উ তোমার দরিয়াতে লয়। তো ফির তলব করে বলে পাঠিয়েছে কি লড়াই লেগেছে। বহুত লোক দরকার! তুমি পুরানা লোক আছ—তুমাকে ভি ছাড়া চলবে না। তাই যেছি, বলি দেখি—'

'কোথায় উঠবে গিয়ে কলকাতায়?'

'আমি? উ জাহাজীদের ডেরা আছে যে গো খোঁকাবাবু। হোথা হতে তোমার নম্বর লিয়ে, টিকস করে, মেডিকেল সার্টিফিকিট হঁয়ে গেল তো বাস জাহাজে—'

'আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে? যাবার ভাড়া আমার আছে। তোমাদের ওখানে কয়েকদিন থাকব। তারপর একটা কিছু দেখে নেওয়া যাবে না কলকাতায়?'

'জরুর! কেনে লিয়ে যাব না! চলো কেনে। বেটা ছেলে বটো—ভয় কি আছে? ই ছুনিয়া, আমার কথাটো খেয়াল কর খোঁকাবাবু, ই ছুনিয়ার হালচাল বহুত খারাপ আছে। আর ইয়ের ছামুতে তুমি ডরাইলে তো বাস খতম। আর না ডরাইলে তো বাস ঠিক আছে। চলো কেনে—'

হাঁ, যাবে বীরু। সামনে একটা অস্পষ্ট জগৎ, বড়োদের জগৎ। সে জগৎটায় এতদিনও সে ঢোকেনি। শুধু কাছাকাছি থেকেছে। শুধু দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আগুনের মতো এক-একটা হলক এসে পড়েছে তার গায়ে। এবার ভেতরে ঢুকবে সে, ঘা মারবে ঘা খাবে। ভয় পাবে না সে, ভয় পেলে খতম!

একটু পেছিয়ে বীরু শেষবারের মতো পেছনে তাকিয়ে দেখে। ধুলো-ধুলো পথটা মোচড় খেতে খেতে গিয়ে মিশেছে একমুঠো ধূসর একাকার দালানকোঠা, স্কুল-আদালত, দোকানপাটের কোলে। তার আবাল্যের শহর। এই শহরের গণ্ডিটাকে সে এই মুহূর্তে যত ঘৃণা করছে এমন আর কখনো করেনি। তবু কখন এক সময় কাঁদতে শুরু করে বীরু। শহরটার জন্যে কান্না। যে কৈশোর সে ফেলে চলে এল তার জন্যে কান্না। আর কান্না

দিদিমার জন্যে, রতনের জন্যে কান্না। সেকেণ্ড পণ্ডিতের জন্যে কান্না, জ্যোতির জন্যে কান্না। মোহিনীদেবী, পূর্ণচন্দ্র, রামচন্দ্রের জন্যে কান্না। কচি একটা মুখের জন্যে। সুধার মুখ। যে মুখ একদিন টিপ করে বীরুকে প্রণাম করে লজ্জায় নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিল। আর বয়স হবার আগেই সে মুখ অকালধর্ষণে বীভৎস হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে মুখের ছবিটা একাকার হয়ে মিশে যায় শহরের ছবিটার সঙ্গে আর শহরের ছবিটা মিশে যায় এক অস্পষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে—সে সংজ্ঞার নাম বাঙলাদেশ।

'খোঁকাবাবু হাঁটতে লারছ?' ইয়াসিন মুখ ঘুরিয়ে জিগগেস করে।

আর চোখ-ফাটা জ্বালায় গড়িয়ে-গড়িয়ে-নামা কৈশোরের শেষ কান্নাটুকু, প্রেমের প্রথম কান্নাটা আনাড়ির মতো মুছে নিয়ে বীরু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ ধরে ইয়াসিনের।

॥ সমাপ্ত ॥



যামিনী রায় ও শিল্পবিচার প্রসঙ্গে

পরিচয় সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীমান অশোক মিত্র শিল্পবিচার ও যামিনী রায় কোন বিষয়েই আমার প্রশ্নগুলির আলোচনা করতে পারেননি। শ্রীমানের শিল্প-সমালোচনার ভুলভ্রান্তি বেছে গাঁ উজাড় করার ইচ্ছা আমার ছিল না, নেইও। চিত্রকলার বিষয়ে, ভারতীয় চিত্রকলার বিষয়ে এবং যামিনী রায় মহাশয়ের কাজের বিষয়ে শ্রীমানের অসতর্ক অসম্মানজনক হঠোক্তি-প্রসঙ্গে আমি শুধু কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলুম, কিন্তু তিনি উত্তরে ক্ষিপ্তপ্রায় কটূকাটব্য করছেন বর্তমান লেখককে, অবশ্য সজ্ঞানে নয়, যারপর নাই ক্রুদ্ধ হয়ে। কিন্তু ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

আমি শ্রীমান মিত্রের আত্মজীবনীর জের টেনে শুধু পরিচয়-পাঠকদের দুটি কথা জানানো কর্তব্য মনে করি। শ্রীমান মিত্র বহুকাল ধরে রমের বই আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এবং সত্যই আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি রম সাহেবের কয়েকটি পৃষ্ঠা "দুষ্টুমি" করে আত্মসাৎ করেছেন স্বীকারোক্তি না করে। আমি অবশ্য বরাবরই এ রকম "দুষ্টুমি"র বিরুদ্ধে। কিছুকাল আগেও তাঁকে আমি এই মর্মে পরামর্শ দিই, যেমন শ্রীমানের 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা"-র পাণ্ডুলিপি পাঠের সময়ে সব মূল বইগুলির তালিকা দিতে বলি। ভারতীয় চিত্রকলার কয়েকশো-পৃষ্ঠা-ব্যাপী পাণ্ডুলিপি পাঠের সময়েও শ্রীমানকে আমি সাবধান করি। কিন্তু নগণ্য বৃদ্ধের কাছে ধর্মের কাহিনী সবাই কি শোনে? অনুবাদ বা নির্যাস বহু বই থেকে করলেও সেটা সোজাসুজি করাই ভালো, তা সে হোক্ না আমাদের দেশের অজন্তার বা আর কোনো বিষয়েই। বিশৃঙ্খল স্বকীয়তার চেয়ে পরিচ্ছন্নতাই শিল্পেতিহাসে কাম্য।

শ্রীমানের ধারণা তিনি শূদ্রের পুরোহিত এবং বাংলাদেশের কিশোর তথা পূর্ণবয়স্ক সাধারণ মানুষেরা আমরা সবাই শূদ্র এবং শূদ্রেরা গভীর বিষয়, সীরিঅস কিছু, সৎ কিছু বোঝে না, তাই তিনি নাকি তাঁর ভারাক্রান্ত লেখায়

এক কল্পিত হাল্‌কাম্নি আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ মনোভাবে বাঙালী পাঠককে অকারণে হেয় মনে করাটাই সমর্থন পায়। লেখকের চিন্তার যা শ্রেষ্ঠ, সাধ্যমতো তাই পরিবেশন করাই লেখকের কর্তব্য এবং জিজ্ঞাসু পাঠক ঠিকই বুঝে নেবেন শেষ পর্যন্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে ভাবা উচিত পাঠকমাত্রেই "ব্রাহ্মণ" এবং লেখকমাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যের অধিকার অর্জনের নম্র চেষ্টা। পরিচয় পত্রের তথা বাংলার সাধারণ পাঠক সম্বন্ধে এই অবজ্ঞা আছে বলেই শ্রীমান মিত্র 'রম' বিষয়ে চাতুরীর আশ্রয় নেন। সেই জন্যই তিনি তাঁর কল্পিত সাধারণ পাঠককে, বিশেষ করে মার্কস্‌বাদী পাঠককে ছলে কৌশলে অভিভূত করে দেবার আশায় 'রম'—রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ইত্যাদি বকেন এবং তারপরে কয় পৃষ্ঠার তাজ্জব উদ্ধৃতির পরে আবার লিখে দেন: "ইসোনিজ, মস্কো"। কিন্তু বাঙালী পাঠককে এবং মার্কসবাদী পাঠককে এ রকম খেল্ দেখিয়ে কি অভিভূত করা যায়? তাঁরা বিচার করতে পারেন, তাঁরা জানেন যে মস্কোতে মতামতের স্বাধীনতা প্রচুর এবং অনেকের বইই কোনো না কোনো সময়ে মস্কো থেকে বেরিয়েছে। পাভ্‌লেঙ্কো সত্যই খুব ভালো রুশ ঔপন্যাসিক, তাই বলে কি আধুনিক চিত্রকলার বিষয়ে তাঁর মতামত সর্বতোভাবে মানতে হবে? যুক্তির অবতারণায় মাছি মারার দরকার নেই। রম্ মস্কোর লোক, ইহুদি কিনা, বুদ্ধিবাদী কিনা, তাঁর কি কি বই শ্রীমান মিত্র জোগাড় করেছেন, ইতিহাস ও শিল্প আলোচনায় পেরেভেরজেভ্ পোক্রোভস্কির যান্ত্রিক ঝোঁক রুশদেশে কিভাবে শোধিত হল, এ সব কথা এখানে গৌণ। কারণ, অশোক মিত্র রমের লেখা বুঝতেই পারেন নি। রম্ যে নামগুলি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, সেইগুলিই অশোক মিত্র না বুঝে বিজ্ঞাপনের "একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম" বংশপঞ্জী হিসাবে অপব্যবহার করেছেন। তাঁর মর্মবিদারক অনুবাদেই তাঁর ভয়ঙ্করী বিদ্যার ভ্রান্তি স্পষ্ট। প্রথম বাক্যটিই ধরা যাক্: Painting as we know it **in the creations of the Venetians**" ইত্যাদিকে তিনি করেছেন: "আমরা **ইওরোপীয় চিত্রকলা** বলতে যা বুঝি তা হচ্ছে ভিনিশান্ শিল্পী **প্রভৃতির সৃষ্টি**"। "·· **is conceived** as an intergral whole"—এর বাংলা করেছেন: "এক অখণ্ড সমগ্ররূপে **সঞ্চারিত** হয়েছে"! কিংবা তাঁর শেষ বাক্যটাই ধরুন: "his stiriving for her-mony, **calm and abstract beauty, free of subject matter**"-এর

বাংলা করেন : **ছবিতে আনতে চান** হার্মনি, **শুদ্ধতা, শান্তি, সুশীত** **অনুভূতি, বস্তুবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য**" ! এবং far removed from everyday life"—এর বাংলা করেন : "দৈনন্দিন জীবনের ঘাম, লড়াইএর কোনও সম্বন্ধ নেই"। অশোক মিত্র এত ঘামেন ও লড়েন যে মাতিস বিষয়ে লুই আরাগঁ-র কথায় কান দেবার সময় পান না, তাই তাঁর চোখে পড়ে না মাতিসের প্রামাণ্য সমালোচক জঁ কাস্যু যাকে বলেছেন মাতিসের তিরিশ দশকের ছবির গঠনবিস্তার, তার প্রাচুর্য, তার গভীরতা, যার ফলে আসে জীবনের ও গতির একটা মহান্ অর্থময়তা। তবু অশোক মিত্র তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের গর্বে ভারতীয় শিল্পালোচনাতেও দেশী শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে !

শিল্পসাহিত্যের বিচারে সর্বদাই জাগ্রত মনন দরকার। যেখানে দেব-দূতেরাও পা ফেলতে ভয় পান, সেখানে অধীর দাপাদাপি বিপজ্জনক। আর এত তাড়াই বা কেন? শ্রীমান মিত্রের "পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা" পুস্তকের শেষে পড়েছি যে তাঁর জন্ম ১৯১৭ সালে। বইটই লেখার বিষয়ে তিনি আরেকটু ধৈর্য ধরুন। তাহলে তিনি শিল্পকার্য বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু রুচিজ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এবং তখন সেই ছেলেটির মতো তিনি কথায় কথায় চটে যাবেন না, পশ্চিমের শুক্‌নো হাওয়ায় পাতার কাঁপন দেখে খাপ্পা হয়ে যে বলেছিল : জল পড়ে পাতা নড়ে, জানো না বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন? জল না পড়লে পাতা নড়বে না।

বিশেষ করেই রুচি ও বোধের দরকার ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনায়, কারণ ইউরোপীয় শিল্পালোচনার মান ও জ্ঞান এ বিরাট দেশের শিল্পালোচনায় এখনও চালু হয়নি, বিদেশী ও স্বদেশী মনীষীরা অনেক প্রাথমিক কাজ করে গেলেও। পরশপাথর হয়তো কিছু অশোক মিত্রকে খুঁজে খুঁজে ফিরতে হবে কিন্তু মন স্থির না করলে খেয়ালও থাকবে না কখন পাথর হাতে এল আর গেল। তাঁর শেষ পারাগ্রাফের বিষয়ে তাই কিছু বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, কারণ পর্বটি শেষ হয়েছে not with a bang, but a whimper (এলিঅট : কাব্য সঙ্কলন : ফেবর এণ্ড্ ফেবর, লণ্ডন)।

বিষ্ণু দে

অশোক মিত্রের পত্র

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের উপভোগ্য লেখাটি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানবেন। এই প্রথম বোধ হয় তিনি মোটামুটি সহজবোধ্য ভাষায় লিখলেন : হয়ত সীমানা আন্দোলনের ফল। ইতি ২রা ফেব্রুয়ারি।

অশোক মিত্র

সম্পাদকের বক্তব্য

এই বিষয়ে আর কোন বাদানুবাদ পরিচয়ে প্রকাশিত হবে না।

সম্পাদক পরিচয়।

॥ পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে ॥

সবিনয় নিবেদন,

পৌষ '৬২ সংখ্যায় শ্রীহিতেন ঘোষের লেখা 'পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে' পড়লাম।

শারদীয় সংখ্যায় শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্তের আলোচনা পড়েই প্রতিবাদ-স্পৃহা জেগেছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগ অভাবে হয়ে ওঠেনি।

হিতেনবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত একমত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তিনি শ্রীসত্যজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সেটা ধোঁয়াটে।

আমার যতদূর মনে হয় পথের পাঁচালী উপন্যাস আর নাট্যরূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ। অর্থাৎ এই উপন্যাসের 'দৃশ্যরূপে' কিছু গোলমাল তিনি দেখতে পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রাচীন সাহিত্যের পুনর্লিখন প্রস্তাব যদি হাস্যকর হয়, তবে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী"র চিত্ররূপই বা এদিক থেকে অনুমোদনীয় হবে কেন?—না হওয়ার কারণই বা কি? তবে আজকে কেউ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যীয় অনুবাদের চিত্ররূপ আশা করে না—একথা সত্যি। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'কে দৃশ্যবস্তুতে পরিণত করতে গেলে, তার বিষয়কে দৃশ্যত্ব দান করতে গেলে তার (উপন্যাসের) আদিমরূপ রক্ষা করা কখনই সম্ভব হয় না। দৃশ্যত্ব দান না করতে হলে শুধু আবৃত্তি করতে হয়। নাটকীয় উপাদানের মধ্যে দৃশ্যত্ব ও কথোপকথন দুটোই প্রাণস্বরূপ। তার কিছু হানি মোটেই সত্যজিৎবাবু করেন নি। তবে তার মধ্যে গতি বা action আবিষ্কার সহজ নয়। অন্তত এই 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে।

দে. প্র. চ.

সমালোচনা

বই

উনবিংশ শতাব্দীর পথিক ॥ অরবিন্দ পোদ্দার ॥ ইণ্ডিয়ানা লিমিটে
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ তিন টাকা

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ মুখ্যত এই কয়জন বিশি ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে এই বইখানিতে উনিশ শতকের সমাজ বিকাশের ধারার এক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে।

উনিশ শতকের সমাজ-বিকাশের বৈচিত্র্যময় ধারার বর্ণনা বইখানির মূ বিষয়বস্তু নয়, বরং তৎকালীন ঘটনা-সম্ভারের যথাযথ বিশ্লেষণ লেখকের প্রধা লক্ষ্য। লেখক নিজস্ব মত অনুযায়ী উনিশ শতকের সমাজ-বিকাশের ধা এবং তার সংস্কৃতি ও ভাবধারার একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এই বইখানিতে উপস্থিত করেছেন। এই দিক থেকে দেখলে বইখানির একটি বিশেষ মূ রয়েছে। লেখকের বিশ্লেষণ কতটা ইতিহাস-সম্মত, কতটা বিচারগ্রাহ্য অবশ্যই ভেবে দেখার প্রয়োজন।

প্রথমেই খুব সংক্ষিপ্ত কথায় লেখক-কৃত বিশ্লেষণের মোদ্দা কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

লেখক মনে করেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র এবং কতকাং বিবেকানন্দ উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের পথিকৃৎ, তদানীন্তন কালে "সমাজ-বিপ্লবের"ও তাঁরা পুরোহিত! এই জাতীয় জাগরণের প্রকৃতিগ বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন—ইংরেজের কাছে সেদিনের শিক্ষি

সম্প্রদায় নতুন জ্ঞান, নতুন বিজ্ঞান, নতুন মানস-চিন্তা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা তাঁরা ভাবেন নি, বরং ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতেই তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের উন্নতি! লেখকের কথায়—

"ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক, তার কর্মে নবীন গতি, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব বাণী, সে বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব, আর ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য সমষ্টিগতভাবে না হোক ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধির দ্যোতক; সুতরাং এই সব ব্যবহারিক সুফল থেকে যদি বঞ্চিত হতে না হয়, তাহলে ইংরেজকে সমর্থন কর, তার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হও—ইহাই কালের নীরব নির্দেশ।

"ঐ আমলের বাঙালী চিন্তানায়কবৃন্দ কালের নির্দেশ পালন করেছেন, অন্যথা করেন নি। ("উনবিংশ শতাব্দীর পথিক"—পৃঃ ১০)

পাছে কেউ আপত্তি তোলে এই বলে যে ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষাই হল 'কালের নির্দেশ'—এ কি রকমের কথা হল—তাই অরবিন্দবাবু সাবধান হয়ে বলতে চেয়েছেন যে তখনকার দিনে জনগণের আন্দোলন বলে কোন কিছুই ছিল না, আর ছিল না বলে এই অনুগ্রহ ভিক্ষাই সেদিনের একমাত্র বিপ্লব!

লেখকের কথায়—"অবশ্য, কালের যাত্রাপথে অর্থনৈতিক এবং স্থানিক বহু সামাজিক কারণে বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে, আবার সে বিদ্রোহ দমিতও হয়েছে। সেই বিদ্রোহের প্রতি দরদ, সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং বিদ্রোহকে সমর্থনও কেউ কেউ করেছেন, আবার ঐ-সব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ 'বিপ্লব চাই' এ-কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সত্য সত্যই বিপ্লব চাওয়ার জন্যে যে রাজনৈতিক চেতনা, কালপ্রবাহ সম্পর্কে যে বোধ (আধুনিক অর্থে), তার উদ্বোধন তখনও হয় নি, এবং হয় নি বলেই তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে 'বিপ্লব' ভারতবর্ষীয় সভা অথবা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী গুপ্ত সভাসমিতি স্থাপনেই পর্যবসিত হয়েছে। বিপ্লবের আধুনিক অর্থ এবং তৎকালীন অর্থ তাই এক নয়; তৎকালীন অর্থ বড় জোর ইংরেজী শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্তের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, এবং ইংরেজের

কর্তব্যভার লাঘব করার জন্যেই তাঁরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সম্পর্ক করার জন্যে নয়।" (উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—পৃঃ ১৩৬)।

অরবিন্দবাবুর মতে তাহলে সোজা কথায় যা দাঁড়াল তা হল এই—উনি শতকের বাঙলায় সমাজ-বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় দুটো কথা প্রথম, উনিশ শতকে জনগণের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই, দুচারটি কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছে তার ভূমিকা নগণ্য, ইংরেজের শাসনের গায়ে আঁচড় লাগাতে পারে নি মোটেই। দ্বিতীয়, জনগণ যদিও তখন মূক ও বধি ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এক শ্রেণী এই মূক ও বধির জনসাধারণের মু ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইংরেজের অনুগ্রহপ্রার্থী বুদ্ধিজীবীরাই তখ নব মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা, এঁরাই ইংরেজের সহযোগী হলেও তদানীন্তন সমা মানদণ্ডে 'বিপ্লবের' একমাত্র পতাকাবাহী।

কোন ভুল বোঝার অবসর না দেওয়ার জন্য প্রথমেই বলে রাখা ভাল অরবিন্দবাবুর উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে যে কিছু কিছু আংশিক সত্য রয়ে তা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। আংশিক সত্য এইখানে যে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলির সত্যিই যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। প্রধান দুর্বলতা হল এগু স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, আজকের মতো উন্নত ধরনের শ্রেণীচেতনার দ্বারা এ বিদ্রোহগুলি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে নাই! সেইজন্যই এই বিদ্রোহগুলি ব্যর্থতা পর্যবসিত হয়েছিল। আরও একটা আংশিক সত্য এইখানে যে ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা উনিশ শতকের অবস্থার মানদণ্ডে অবশ্যই ছিলে প্রগতিশীল। কারণ তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও ইংরেজী ব্যবস্থার মা রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করে যেটুকু গণতান্ত্রিক সংস্কারবাদের পথ পরিষ্কা করে গেছেন তার মূল্য কম নয়। এক কথায় বলা চলে যাঁরা উনিশ শতকে কৃষক-বিদ্রোহগুলির ভূমিকা বাড়িয়ে দেখেন অর্থাৎ বিদ্রোহগুলিকে বুর্জো বিপ্লবের দ্যোতক বলে মনে করেন অথবা যাঁরা উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদে সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন আমরা তাঁদের সঙ্গে এক মত নই। এই ধরনের অনৈতিহাসিক অতিবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য বর্জনীয়।

কিন্তু উপরোক্ত এই অতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যেমন আমাদের মূলগ মতপার্থক্য রয়েছে, তেমন অরবিন্দবাবুর সঙ্গেও আমাদের মৌলিক মতপার্থক্য

রয়েছে। উপরোক্ত অতি-বিপ্লবীরা যেমন কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করেছেন এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখেছেন, তেমনি অরবিন্দবাবুরও আবার কৃষকবিদ্রোহগুলির ভূমিকা অস্বীকার করেছেন এবং বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে বড্ড বড় করে দেখেছেন।

অবশ্য, উপরোক্ত অতি-বিপ্লবী ও অরবিন্দবাবুর মধ্যে তফাত এইখানে যে অতি-বিপ্লবীরা দাবি করতে পারেন এক ধরনের 'মৌলিকত্ব', অর্থাৎ যতই আজগুবি কথা হোক না কেন, তাঁরা বলতে পারেন তাঁদের আগে এমন কথা আর কেউ বলতে পারেন নি! অরবিন্দবাবু এ-বিষয়েও হতভাগ্য! 'মৌলিকত্ব' দাবি করার সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত। বঞ্চিত এইজন্য যে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশেরা আবহমান কাল থেকেই বলে আসছেন। বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদের যে কোন কেতাব খুলুন, দেখবেন—কৃষকবিদ্রোহগুলি সম্পর্কে একদিকে উন্নাসিক মনোভাব, ধরনটা এইরকম যে ঐগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, অন্যদিকে উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস' নিয়ে কত বাগাড়ম্বর।

বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদের এই ভাবধারার সঙ্গে অরবিন্দবাবুর ভাবধারা মিলিয়ে দেখুন—এই দুইয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে। সাধারণভাবে উনিশ শতকের কৃষক-বিদ্রোহগুলি ও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে অরবিন্দবাবু লিখছেন—

"বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগনায় রীতিমত অরাজকতা দেখা দেয়। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এই বিদ্রোহ বিনা আয়াসেই দমন করিতে সক্ষম হন"। ("বঙ্কিম মানস," পৃঃ ৪৯)

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশদেরও হার মানিয়েছেন। তিনি লিখছেন "সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নহে, ইহা ভারতীয় সামন্তরাজদের আত্মকর্তৃত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা। কিন্তু তথাপি বিদ্রোহের বিস্তৃতিতে ইহা কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী লোক-সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।"

কিন্তু অরবিন্দ বাবু যাই বলুন—হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে একটানা প্রতিরোধের এক গৌরবময় ইতিহাস—এ-কথা আর অস্বীকার

করার উপায় 'নাই। এমনকি বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যেও যাঁরা তথ্যানুসন্ধানী ও সত্যনিষ্ঠ তাঁরাও উত্তরোত্তর এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করেছেন। যা ঘটেছে তাকে কালের নির্দেশ-নামা থেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাদ দিলেই বাদ দেওয়া যায় না।

মনে রাখা দরকার ইংরেজি শিক্ষিত প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলা আরম্ভের অনেক আগে থেকেই এই কৃষক বিদ্রোহগুলির ভূমিকা শু হয়েছে। কখনও পশ্চিম বঙ্গে, কখনও দক্ষিণ বঙ্গে, কখনও উত্তর পূর্ব বঙ্গে আলাদা-আলাদা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হলেও কৃষক বিদ্রোহের একটানা প্রতিরোধ ইংরেজ শাসনকে সবচেয়ে আতঙ্কিত করে তুলেছিল স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি বিদ্রোহের (যা শুধু বাঙলা দেশে ঘটেছিল) না উল্লেখ করছি :—

(১) উত্তর বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—(১৭৬০ –১৭৭৪) (২) বিষ্ণুপুরের বিদ্রোহ—(১৭৭৩)। (৩) বীরভূমের বিদ্রোহ (১৭৮৫)। (৪) বারাসতের বিদ্রোহ—(১৮৩১)। (৫) ফরিদপুরের বিদ্রোহ—(১৮৪৭)। (৬) সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)। (৭) সিপাহী বিদ্রোহ—(১৮৫৭), (৮) নীল বিদ্রোহ (১৮৫৬-৬০) (৯) পাবনার কৃষক বিদ্রোহ—(১৮৭০) আমি পূর্বে বলেছি এই বিদ্রোহগুলির দুর্বলতা ছিল প্রচুর। আলাদা আলাদা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হওয়ায় এইগুলিকে ইংরেজের পক্ষে দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাসে এই কথাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে কৃষক বিদ্রোহ সফল হতে হলে প্রয়োজন—হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব নয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের কথাই ওঠে না।। বুর্জোয়া শ্রেণীর গোত্র হিসাবে এই সময়ে যে বুদ্ধিজীবীরা উদ্ভূত হয়েছিলেন তাঁরাও এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে পারেন নাই। নেতৃত্ব দেওয়া দূরের কথা, তাঁরা এই বিদ্রোহের সংসর্গ বাঁচিয়ে চলেছিলেন, অনেকে সক্রিয়ভাবে এর বিরোধিতাও করেছিলেন। কাজেই এই বিদ্রোহগুলি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে কোনদিন উঠতে পারে নি।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে এইগুলি বিপ্লবই নয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে কি আর কখনও বিপ্লব হয়নি? ইতিহাসে দাস-বিদ্রোহ, ভূমিদাস বিদ্রোহের ভূমিকা কি উপেক্ষণীয়!

ঠিক সেই রকম আমাদের দেশের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহগুলিও তদানীন্তন সময়ের মানদণ্ডে বিচার করলে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বিদ্রোহগুলি বিদেশী শাসনকে যে-ভাবে আঘাত হেনেছিল তদানীন্তন অবস্থায় আর কোন আন্দোলনই তা পারে নাই। ইংরেজরা বিনা আয়াসে এই বিদ্রোহগুলি দমন করেছিল— অরবিন্দবাবুর এই থিসিস ইতিহাসগ্রাহ্য নয়। এই আন্দোলনগুলি সম্পর্কিত যে কোন ব্রিটিশ রিপোর্ট পড়ুন, দেখবেন তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকেরা এই সব আন্দোলনকে কি রকম ভয়ের চোখে দেখেছিলেন এবং কি রকম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল তারও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

১৮৮০ সালে ভারতের পুঞ্জীভূত কৃষকদের এই বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়েই ডাফরিন হিউম সাহেবকে বুদ্ধিজীবীদের ভিড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এ-কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

অবশ্য ইংরেজ যে উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস আন্দোলনকে প্রথম দিকে সাহায্য করে থাকুক, অথবা আরও পূর্বে যে উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজরা ইংরেজিশিক্ষিত অনুগ্রহপ্রার্থী বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে থাকুক, পরে তার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। পরাধীন দেশের এই বুদ্ধিজীবীরা বুর্জোয়া চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার পর থেকে ইংরেজের সঙ্গে তাদের বিরোধ শুরু হতে থাকে।

এই বুদ্ধিজীবীদের মনে ইওরোপের বুর্জোয়া প্রগতিশীলতার নেশা লাগে। এঁরা শুরু করেন মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সংস্কার এঁদের আন্দোলনের হয়ে ওঠে জয়টীকা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতির ভাবনায়-চিন্তায় বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাবধারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাবধারা এঁদের তদানীন্তন সময়ের মানদণ্ডের বিচারে দেশগঠনের কাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সন্দেহ নাই। তাই এই আন্দোলনের ভূমিকাও যে প্রগতিশীল তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার্য।

তবে প্রগতিশীল বলেই এই আন্দোলনকে বিপ্লববাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করলে একটু বাড়াবাড়ি করা হবে। এই আন্দোলন মূলত সংস্কার-বাদী। তাই এই আন্দোলনের নেতাদের দেখি রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করলেও তাঁরা ইংরেজ শাসনের আওতার মধ্যেই এই সংস্কার দাবি করেছেন।

আরও দেখি এই আন্দোলনের নেতারা সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও সামন্ততন্ত্রের মূল রূপ ভাঙবার উপায় হিসাবে মুখ্যত কৃষি সংস্কারের দাবি তাঁরা কখনও উত্থাপন করেন নাই। এই আন্দোলনের এই মূলগত দুর্বলতার দিকটা সম্পর্কে অবহিত না থাকলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

এক কথায়, তদানীন্তন সময়ে ভারতের সমাজ ছিল পরাধীন সমাজ এবং বিদেশী শাসকেরা এই পরাধীন সমাজ-গঠনের কাজে সহায় হিসাবে পুরাতন সামন্ত সমাজের মূল কাঠামোকে বজায় রাখতে চেয়েছিল। তাই তখনকার দিনে ভারতের মূল প্রশ্নটি ছিল স্বাধীনতার সমস্যা আর সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের সমস্যা।

কাজে কাজেই এই স্বাধীনতা ও সামন্তবাদ ধ্বংসের প্রশ্নটি তদানীন্তন সময়ে আন্দোলনকে যতটুকু অগ্রসর করতে সাহায্য করেছে সেই আন্দোলন ততটুকু প্রগতিশীল। কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই কাজে খুব সাহায্য করেছে, এই বিদ্রোহগুলি তাই যথেষ্ট প্রগতিশীল। আবার দুর্বলতা সত্ত্বেও বুর্জোয়া সংস্কারবাদী আন্দোলনও এই কাজকে অগ্রসর করতে সাহায্য করেছে, তাই এই আন্দোলনের প্রগতিশীলতাও উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই অরবিন্দবাবু যদি উপরোক্ত কৃষক আন্দোলনগুলির বিদ্রোহাত্মক ঐতিহ্য অস্বীকার করে সংস্কারবাদী ধারাটাকেই একমাত্র প্রগতিশীল ঐতিহ্য হিসাবে তুলে ধরেন এবং এইটিই একমাত্র সত্য ধরে নিয়ে রায় দেন যে সেদিন ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষাই ছিল "কালের নির্দেশ", তাহলে বলব নিজের কষ্টকল্পিত নির্দেশটি কালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার সহজ পন্থাটি অরবিন্দবাবু যত তাড়াতাড়ি বর্জন করবেন ইতিহাস ও সাহিত্য-সাধনার পক্ষে ততই মঙ্গল।

নরহরি কবিরাজ

॥ **অম্লমধুর** ॥ নারায়ণ চৌধুরী ॥ ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ মূল্য আড়াই টাকা ॥

যতদূর জানা আছে, কোন এক বিজ্ঞাপনবিশারদ প্রকাশন-ব্যবসায়ী তাঁদের প্রচার-পুস্তিকায় রম্যরচনা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভাষার কারচুপি হিসাবে উৎপত্তি হলেও—রম্যরচনা কথাটিকে

উপেক্ষা করার উপায় নেই—কেননা, বাংলা সাহিত্যের জমিতে হালে যে ফসল ফলছে তার বেশ বড় একটা অংশই এখন এই অভিধায় চিহ্নিত—এটা আশা বা আশঙ্কার কারণ যাই হোক।

রম্যরচনা বলতে ঠিক কী যে বোঝায় বলা শক্ত। নক্‌শা, ভ্রমণ-কাহিনী থেকে শুরু করে ইংরাজিতে যাকে সচরাচর Essay বলা হয় সেই ধরনের রচনাও এই নামের নামাবলী এঁটে প্রকাশকের শেল্‌ফে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করছে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই ভিড় পাঁচমিশালি ধরনের হলেও এর মধ্যে একটা তবু ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়—তা হল, ভাষার প্রসাধনে প্রীতি এবং আপাতরমণীয়তার প্রতি অন্ধ অনুরাগ—যার উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন।

আদর্শ হিসাবে কথা সাজানোর পারিপাট্য, রমণীয়তা সব সাহিত্যিক রচনারই গুণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটেই কি শেষ কথা? বলার কথা আছে বলেই পাঠকের মনে তা সংক্রামিত করার জন্যেই কি লেখক কলম নিয়ে বসেন না? বলার কথাটিকে আরও ভালো করে, রসালো করে পরিবেশনের জন্যেই তো প্রসাধনের প্রয়োজন বলে জানি। কিন্তু এখনকার ঝোঁকটা হচ্ছে, কথাবস্তুর অভাবকে বা মামুলি কথাবস্তুকে ভাষার চটুলতা (অনেক ক্ষেত্রে যা চাপল্যেরই প্রকারভেদ) দিয়ে ঢেকে রাখা। এখনকার ফ্যাশনের দাবি হচ্ছে, এমন লেখা লেখো যা হচ্ছে অনিদ্রারোগের ওষুধ, যা লোকে শুয়ে শুয়ে পড়বে, ট্রেনে কি ট্রামে যেতে পড়বে, এমনকি কমোডে বসেও পড়বে এবং পড়েই যা স্বচ্ছন্দে ভুলে যাবে। অর্থাৎ দাবিটা হচ্ছে বেদনাহীন প্রসবের মত ভাবনাহীন পড়ার। বলতেই হচ্ছে, একে যাঁরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য এবং প্রাণশক্তির লক্ষণ বলে মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের মৌলিক গরমিল রয়েছে।

প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে নারায়ণবাবু অপরিচিত নন। অনেকক্ষেত্রে মতের গুরুতর অমিল থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনেক প্রবন্ধে আমরা চিন্তার খোরাক পেয়েছি। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পর্কেও এ-কথা বলতে পারলে আমরা অখুশি হতাম না। কিন্তু মনে হচ্ছে, নারায়ণবাবুও ফ্যাশনের দাবির কাছে হার মেনেছেন। ফলে মতের তীক্ষ্ণতা ও নির্দিষ্টতা অনুপস্থিত, রম্যতা-সাধনও অসফল।

অম্লমধুরে সংকলিত প্রবন্ধগুলি Essay-জাতীয়। আর Essay-জাতী রচনার সাফল্যের মূলকথা হচ্ছে লেখকের চিন্তার স্বকীয়তা এবং রচনা মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিভাত করা। নারায়ণবাবুর বর্তমান পর্যায়ে প্রবন্ধগুলিতে এ-দুটি গুণেরই অভাব দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হয়েছি।

শচীন বসু

নহবৎ ॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ ক্যালকাটা পাবলিশার্স ॥ আড়াই টাকা ॥

তরুণ লেখক চিত্তরঞ্জন ঘোষের কয়েকটি গল্পের সংকলন। নিছক গ বলেই তিনি তৃপ্ত নন—প্রত্যেকটি গল্পের পিছনে একটি মানবিক সামাজি প্রশ্নও তিনি উপস্থিত করতে চেয়েছেন এবং কয়েকটি গল্পে বেশ সাফল্যে সঙ্গেই তা করেছেন। প্রথম গল্পের বই বলে লেখক স্বভাবতই নানাদিকে হাত বাড়িয়েছেন। নিম্নমধ্যবিত্তের চরিত্র থেকে শুরু করে গ্রাম্য গরি এবং চটকলমজুর পর্যন্ত, এবং নির্বাক বেদনা থেকে শুরু করে তীব্র ব্য পর্যন্ত নানা চরিত্র ও নানা সুর নিয়ে কাহিনী গড়েছেন, যদিও আমার কাছে তাঁর নাগরিক জীবনের কাহিনীগুলিকেই বেশি সার্থক বলে মনে হয়েছে। এই দিক দিয়ে 'ত্রোটিন' এবং 'কাহুন' গল্পটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি গল্পের মধ্যেই যে একটি সপ্রশ্ন বেদনাবোধ লেখক যে রকম সু আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাতে তাঁর পরবর্তী পরিণতির জ উৎসুক হয়ে রইলাম। লেখকের কথনভঙ্গির মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গে বেশ একটি আমেজ ফুটেছে। জানি না এ গুণটিকে তিনি তাঁর সাধারণ স্টাইলের অঙ্গীভূত করে রাখবেন নাকি পুরোপুরি ব্যঙ্গ গল্পের মধ্যেই তাকে বিশেষ করে শানিয়ে তুলবেন।

অনতিঅতীতের বাঙলাদেশে তবু এক পরশুরাম ছিলেন ইদানীং তাঁকেও খুঁজে পাচ্ছি না, যদিও রাজশেখর বসু বর্তমান। পাঠক হিসেবে আমি তাই খুশি হবো যদি বাঙলা সাহিত্যে স্যাটায়ারের পুনরুজ্জীবন সত্যিই দেখতে পাই। রসের ভিয়ানে সবটাই নিতান্ত রমণীয় ও 'করুণ রঙীন' না হয়ে অন্তত কিছু অংশে কিছুটা হাসির জলুনি থাক, কিছুটা খরস্রোত ও ক্ষুরদীপ্তি।

নন্দী ভৌমিক

চলচ্চিত্র

শ্রীমতী মারী সীট্‌ন ও কলকাতায় চলচ্চিত্র আন্দোলন

প্রধানত আইজেনস্টাইন সম্পর্কে তাঁর প্রামাণ্য বই-এর জন্যই শ্রীমতী সীট্‌নের খ্যাতি। এবং আইজেনস্টাইনের ছবি বা লেখার সঙ্গে আমাদের দেশের সবিশেষ পরিচয় না থাকলেও তাঁর নাম বহুদিন থেকেই মন্ত্রের মতো কার্যকরী হয়ে আছে। এজন্য শ্রীমতী সীট্‌নকে আহ্বান করে ভারতসরকারের শিক্ষাবিভাগ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়ের এই যোগসূত্রটি না থাকলে বিদেশী সমালোচকের পক্ষে ভারতে বক্তৃতা দিয়ে সফল হওয়া কঠিন হত। অবশ্য শ্রীমতী সীট্‌নের ভারতসফরের সাফল্য অনেকখানি তাঁর নিজগুণেও বটে। তিনি শুধু সুবক্তা নন, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ও বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের মেজাজ এবং জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী ঠিকমতো বক্তব্য পেশ করার বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত।

কলকাতায় শ্রীমতী সীট্‌ন তাঁর 'সেমিনার'এ ছটি বক্তৃতা দেন—১) চলচ্চিত্রবোধ; ২) আইজেনস্টাইনের জীবন ও শিল্পকর্ম; ৩) ফিল্ম—সোসাইটি আন্দোলন; ৪) ডকুমেণ্টারি চলচ্চিত্র ৫) আঁকা ছবির চলচ্চিত্র ৬) মেক্সিকোতে আইজেনস্টাইন। বক্তৃতার সঙ্গে ছিল অপর্যাপ্ত উদাহরণ। উদাহরণের গুণে তাঁর অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ বক্তৃতাও উজ্জ্বল হয়েছে। দেখা গেল যে আইজেনস্টাইনের বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা যত সার্থক হয়েছে ততখানি অন্য বিষয়ে নয়। অবশ্য তার একটি কারণ এই হতে পারে যে অন্যান্য বিষয়গুলি বড়ো বেশি বৃহৎ, এক-একটি বক্তৃতায় সেরে দেবার মতো নয়। তাহলেও আক্ষেপ থেকে যায় যে চলচ্চিত্রবোধের বক্তৃতায় চলচ্চিত্রের গুরু চ্যাপলিনের স্থান নির্ধারিত হল না, বিভিন্ন দেশের ভাবধারার কথা বলতে গিয়ে তিনি ফরাসী রোম্যাণ্টিক বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে গেলেন, ফরাসী, ইতালীয়, রুশ ও ইংরিজী বাস্তবতার সম্পর্কে আলোচনা হল না। তেমনই আবার ডকুমেণ্টারির বিষয়েও ধারাবাহিক কোনো

বিবরণ বা ডকুমেন্টারির মূলসূত্র যা তার বিকাশের গতি স্পষ্ট হল ফিল্ম-সোসাইটি বিষয়ে বক্তৃতাটি অবশ্য খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল, যদি উদাহরণের নির্বাচনে পরীক্ষানিরীক্ষার যেদিকটিতে তিনি ঝোঁক দেন খানিকটা উদ্ভট এবং নিরর্থক। পরীক্ষাগত চলচ্চিত্রের যে সমস্ত কালে চলচ্চিত্রের প্রধান ধারার মধ্যে এসে মিশে তাকে সমৃদ্ধ করে সেই দিকগুলি তাঁর বক্তৃতায় অবহেলিত হল বলে মনে হয়। অরসন্ ওয়েল্স্এর 'সিটিজেন কেইন' কে এক্স্পেরিমেন্টাল বা আভঁ-গার্দ অবশ্যই উচিত, এবং পরবর্তী চলচ্চিত্রে তার অসাধারণ প্রভাব লক্ষি হয়েছে। আইজেনস্টাইনের ছবিতে যদি পরীক্ষা না থাকে তবে পরী খুঁজি কোথায়? আইজেনস্টাইন সম্পর্কে প্রধান বক্তৃতায় শ্রীমতী সী এই পরীক্ষার দিকটিতে বিশেষ জোর দিয়েছেন, কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রধ ধারার উপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করেন নি। বস্তুত তাঁর বক্তৃ মধ্যে ব্যবসায়িক, জনপ্রিয় চলচ্চিত্রকে যেন খাটো করেই আর্ট-ফি বলে একটি বিশিষ্ট ধরনের ছবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ ব্যবসায়িক সিনেমার শীর্ষে রয়েছেন চ্যাপলিন, গ্রীফিথ, জন ফোর্ড রেনোয়া বা ক্লেয়ার। তাঁরা সেইখানে পৌঁছেছেন যেখানে চলচ্চিত্র যেম জনসাধারণের হয়েছে তেমনই আবার শিল্পও হয়েছে। বিশ্বজনীন শি সার্থকতার এই যে ভূমি আজ চলচ্চিত্রে রয়েছে, অন্যান্য শিল্পে প্রায় নে বললেই হয়, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি শ্রীমতী সীটনের বক্তৃতায় গৌণ নয় প্রায় অবলুপ্ত।

অপরপক্ষে আইজেনস্টাইনের বিষয়ে শ্রীমতী সীটন-এর জ্ঞান ও চি পরিধি ও গভীরতায় যথেষ্ট, ফলে এই বিষয়ে তাঁর দুটি বক্তৃতাই, বিশেষ প্রথম বক্তৃতাটি, অতি মনোজ্ঞ হয়েছিল। ভাবে, ভাষায় ও বাচনভঙ্গীতে বিশ্লেষণে, এত সমৃদ্ধ বক্তৃতা ইদানীং শুনেছি বলে মনে পড়ে না আইজেনস্টাইন সম্বন্ধে তাঁর বই-এ যা আছে, বক্তৃতায় তারই সারাং পাওয়া গেল, কিন্তু বলার গুণে ও উদাহরণের সার্থকতায় তার প্র গভীর।

সব মিলিয়ে বলতেই হবে শ্রীমতী সীটন্-এর ভারতসফর বিশেষভা সার্থক। এই প্রথম এদেশে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বক্তৃতা চলচ্চি

মহলের মাঝখানে বসে শোনা গেল, 'এবং এই প্রথম বিদেশ থেকে শুধু চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বলার জন্য কোনো সমালোচককে আহ্বান করা হল। শ্রীমতী সীটন-এর চিন্তা ও বক্তৃতার উঁচু মান—যা অন্য কোনো শিল্প আলোচনার মানের চেয়ে খাটো নয়—তাতেই তাঁর শ্রোতামহলের উপর রীতিমতো প্রভাব বিস্তার করেছে। যেসমস্ত বক্তব্য তিনি বলেছেন সেগুলি যে কিছুই পূর্বে এদেশে বলা হয়নি তা নয়, কিন্তু গুণী বিদেশী সমালোচক সেগুলি অধিকারের সঙ্গে বলার ফলে লোকে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছে ও অনেকখানি গ্রহণ করেছে।

শ্রীমতী সীটন্-এর কলকাতায় আসার একটি সাক্ষাৎ ফল হল কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির পুনর্গঠন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে এবং তাঁর উপস্থিতির ফলে অন্যান্য অনেকের উৎসাহে এই ফিল্ম সোসাইটি আবার জোড়া লাগল। এবারে এই সোসাইটি অনেক ব্যাপকভাবে সৎ চলচ্চিত্রের আন্দোলন পরিচালনা করবেন। দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচয়, সার্থক সমালোচনা, নতুন ধরনের চলচ্চিত্র তৈরীর মন ও জ্ঞান সৃষ্টি করা, লোকের মনকে সৎ চলচ্চিত্রের দিকে আকর্ষণ করা,—এই কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির উদ্দেশ্য। নয় বৎসর আগে যখন এই সোসাইটির গোড়াপত্তন হয়, তখনকার চেয়ে সাধারণের মন আজ অনেক অগ্রসর, চলচ্চিত্রমহল অনেক বেশি সহানুভূতিশীল, মায় সরকারও অনেকাংশে সহযোগী। আশা করা যায় যে এমতাবস্থায় কলকাতায় চলচ্চিত্র আন্দোলন শীঘ্রই শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

বিয়োগপঞ্জী

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

একসময়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে আক্ষেপ শুনেছি যে প্রবোধচন্দ্র বাগচী অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেও বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপের কারণ প্রবোধচন্দ্র মোচন করেন নি, কেননা তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। কিন্তু যোগ দেবার পর শুধু অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি মনপ্রাণ নিয়োগ করেছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কর্তব্য সম্পাদনে। এই কাজে গুরুতর রোগকে উপেক্ষা করার ফলেই তাঁর আয়ুর অকস্মাৎ অবসান ঘটল। বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদে যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটবে বলে মনে হয় না—অতটা দুরবস্থা এখনো আমাদের হয় নি। কিন্তু সাহিত্য-ও-গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু যে শূন্যতার সৃষ্টি করল তা বিশেষভাবে শোচনীয় এই কারণে যে বিশ্বভারতীর কাজের চাপে তিনি গুরুতর রক্তের চাপ অবহেলা না করলে, ঐ শূন্যতা সম্ভবত ঘটত না।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে প্রবোধবাবুর এককালে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই যোগের সূত্র ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তখনকার পরিচয়ের সাপ্তাহিক অধিবেশন মাসে অন্তত একবার হত প্রবোধবাবুর বাড়িতে ও এইখানে নিয়মিত আসতেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। ফরাসি সংস্কৃতির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এঁরা দুইজনেই। অপরপক্ষে, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন ফরাসির তুলনায় জার্মান সংস্কৃতি যে অনেক উঁচু দরের এই নিয়ে তর্ক করতেন তখন আসর জমত ভালোই। তখনকার পরিচয়ের অধিবেশনে দেখা যেত বটকৃষ্ণ ঘোষকে—প্রবোধবাবুর বহু আগেই তাঁর আয়ু ফুরিয়েছে। অনেকের মনে থাকতে পারে একসময়ে শনিবারের চিঠিতে বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রবোধবাবুকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু পরিচয়ের সভায় এঁদের দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু দেখি নি। প্রবোধবাবুর বির্তকের কলম যে বেশ জোরালো ছিল তার

প্রমাণ পাওয়া যায় আশানন্দ নাগের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি কখনও সৌজন্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

হিরণকুমার সান্যাল

অজয় চট্টোপাধ্যায়

তরুণ চিত্রশিল্পী অজয় চট্টোপাধ্যায়ের অকালবিয়োগে সকলেই মর্মাহত হবেন। অজয় সরকারী আর্ট স্কুল থেকে সদ্য উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর আঁকা স্কেচগুলি গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যে বাস্তববোধ ও সজীব প্রাণধর্মের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দিয়ে অজয় তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেছিলেন তাতে আশা করার মতো অনেক কিছু ছিল, যা পূর্ণ হল না।

ননী ভৌমিক

●

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দল

ভারতচীনমৈত্রীসমিতির আমন্ত্রণে চীন থেকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উ হানের নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে এসেছেন তাঁদের স্বাগত জানাই। চীন এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রীতিকর কাজের উদ্যোগ শুধু সরকারী স্তরে নয় বেসরকারী স্তরেও গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে, এইটে মস্ত আশার কথা।

চীনা প্রতিনিধিদলের মধ্যে কবি ও অধ্যাপক লু-কান-জুর সঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে বাঙালী কবিসাহিত্যিকদের যে একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান হয় সেটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আশাকরি দুই দেশের সংস্কৃতি দুই দেশের কাছে ক্রমশই আরো নিকট ও আরো শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবে।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ভারতসোবিয়েতমৈত্রীসমিতির উদ্যোগেও এই মাসেই কলকাতায় আর একজন অতিথি এসেছিলেন, যাঁর নাম কলকাতার শিক্ষিত সাধারণের কাছে যতটা প্রিয় ও পরিচিত বোধহয় আর কোনো বিদেশী লেখকই ততটা হতে পারেন নি। তিনি সোবিয়েত লেখক এরেনবুর্গ।

বক্তৃতা করার চেয়ে কলকাতার অন্তরঙ্গ পরিচয় গ্রহণের জন্যই তিনি

বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে খুব ভালো লাগল, যদিও মিলনমন্দিরের অভ্যর্থনাসভায় তিনি যে অপরূপ ভাষণটি দিয়েছিলেন তা না শুনতে পেলে কলকাতাবাসীর মস্ত ক্ষতি হত সন্দেহ নেই।

কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গেও এরেনবুর্গ একটি ঘনিষ্ঠ আসরে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে তাঁর অনবদ্য সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সোবিয়েত সাহিত্যের বিষয়ে যে রকম স্বচ্ছন্দ ও স্বকীয় ভঙ্গিতে আলোচনা করেন তার স্মৃতি দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো।

বঙ্গসংস্কৃতি

এরেনবুর্গ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী না হয়ে জন্মাতে পারতেন না, আবার যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন তা বিশ্বমানবের কাছেও গ্রহণীয়।

একটু ভিন্ন উপলক্ষ্যে কথাটা স্মরণ করতে চাই। কারণ সংস্কৃতির জাতীয় বিকাশ এবং মহাজাতীয় ঐক্যের মধ্যে যাঁরা সমন্বয় না পেয়ে সংঘাত দেখেন, একটির অবলুপ্তি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেন না, তাঁহাদের 'বিবেচনা' সম্প্রতি বাঙলাদেশের পক্ষে করাল হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'—জাতীয় সংগীতের এই মর্মবাণীটিকে তাঁরা সংশোধন করে শুধু একরাষ্ট্র ভারতীয়ত্বের ধারণায় উন্মাদ হতে চাইছেন।

এই পরিস্থিতিতে বঙ্গসংস্কৃতির স্বরূপ, তার গৌরব ও বৈশিষ্ট্য, তার বাঙালী জাতীয়তা ও ভারতীয় মহাজাতীয়তা সম্পর্কে নতুন করে এবং গভীর ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলন প্রতিবারের মতো এবারেও বাঙালী সংগীত, নৃত্য, আলোচনা প্রভৃতির যে আয়োজন করেছেন, আশা করি তা থেকে একটি বৃহৎ সার্থকতা সম্ভব হবে।

এবং খ্যাতনামা সংস্কৃতিবিদ্‌দের একাংশের মধ্যে বিহ্বলতা সত্ত্বেও বঙ্গবিহার একীকরণের সর্বনাশা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যে সমবেতভাবে সজাগ হয়ে উঠতে দেরি করেন নি, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এবং বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ দেবার সময় যখন এল তখন যে তাঁরা আন্দোলনে কণ্ঠ মেলাতে দ্বিধা করেন নি, তার জন্য সাগ্রহ অভিনন্দন জানাই।

ননী ভৌমিক

মাঘ, ১৩৬২
PARICHAYA ● February 1956 ● Reg. No.

গ্রাহকদের জ্ঞাতব্য

* শ্রাবণ মাসে পরিচয়-এর বর্ষ আরম্ভ। প্রতি সাধারণ
মূল্য দশ আনা। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া
গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৬ টাকা; ষান্মাসিক ৩ টাকা ৪ আনা।

* টাকা-কড়ি, ব্যবসায়িক চিঠিপত্র এই ঠিকানায় প্রে
ম্যানেজার 'পরিচয়', ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

* চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করা থাকলে কাজের
হয়। যাঁদের চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করা থাকে
অভিযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্র
সম্ভব হয়। অন্যথা, দেরি হয়। গ্রাহকেরা নিজেদের স্বা
আমাদের সুবিধার দিকে চেয়ে **গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করবে**
আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

* প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে
প্রকাশিত হয়। ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পেলে গ্রা
দয়া করে ডাকঘরে অভিযোগ পেশ করবেন, এবং ২৫ তা
মধ্যে আমাদের জানাবেন।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮।৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকা

দাম দশ আনা

পরিচয়



ফাল্গুন, ১৩৬২